দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

খোমেইনির মৃত্যুতে ভারতের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মাথাব্যথা কেন? — পৃঃ ১১

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ
হরমুজ প্রণালীই নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে — পৃঃ ১৩

৭৮ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ৩০ মার্চ, ২০২৬।। ১৫ চৈত্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান কী?

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১৫ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৩০ মার্চ - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘ফল্টি লিডার’-এর হাত ধরে তৃণমূলের আগমনের মধ্যেই ছিল বিদায়বার্তা— ‘যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল...’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ভোটে থার্ড আম্পায়ার! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

চক্রব্যূহে আটকে পড়েছে আমেরিকা ◻ অমোল পেডণেকর ◻ ৮

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

ইরান, আমেরিকা, ইজরায়েলের দ্বন্দ্ব—খোমেইনির মৃত্যুতে ভারতের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মাথাব্যথা কেন? ◻ বরুণ মণ্ডল ◻ ১১

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ : হরমুজ প্রণালীই নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে ◻ শ্যামলকান্তি মজুমদার ◻ ১৩

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্য-প্রাচ্য নীতি : ভারতের শক্তিশালী কূটনৈতিক অবস্থানের পরিচয় বহন করছে ◻ সুশান্ত মজুমদার ◻ ১৫

নির্বাচন ২০২৬—পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্তির নির্বাচন ◻ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১৭

পশ্চিমবঙ্গের মুখ শুভেন্দু অধিকারী ◻ সুবল সরদার ◻ ১৯

এবারের নির্বাচন এক অপশাসন অবসানের নির্বাচন ◻ তারক সাহা ◻ ২০

নারীর ক্ষমতায়নে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ২১

অতিরিক্ত আর্থিক মুনাফাই হলো মার্কিন যুদ্ধ অর্থনীতির মূল ভিত্তি ◻ পূর্ব রায়চৌধুরী ◻ ২৩

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান কী হওয়া উচিত? ◻ ডাঃ মধুসূদন পাল ◻ ২৪

সততা, অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন তীর্থঙ্কর মহাবীর ◻ সরোজ চক্রবর্তী ◻ ৩১

পাতাললোকেও শ্রীহনুমান দুষ্টের দমন করেন ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩৩

আগামী বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশ পরম বৈভবশালী হবে : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ◻ ৩৬

মাওমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে— মাওবাদী লাল সন্ত্রাস এখন লালগড়েও খাদের কিনারায় ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৪৩

আমার সঙ্ঘজীবনের ইতিকথা ◻ অবনীভূষণ মণ্ডল ◻ ৪৭

অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে এখন না পালটালে সব হারাতে হবে ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০** ◻ **খেলা : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻

প্রকাশিত হবে
৬ এপ্রিল
২০২৬

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৬ এপ্রিল
২০২৬

নৈরাজ্যের অবসান হবে কি?

এরাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। শাসকের মদতে নির্বাচনকে ঘিরে এরাজ্যে বছরের পর বছর যেভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা আজ কারও অজানা নয়। খুন-জখম, হানাহানি, ভোট লুঠ এরাজ্যের নির্বাচনের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই অরাজক পরিস্থিতির অবসানে নির্বাচন কমিশন এবারে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। নির্বাচন কমিশনের অঙ্গীকার আর রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অংশগ্রহণেই রাজ্যের চালচিত্র পালটে দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কতটা সফল হবে সেটাই দেখার।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় প্রাক্-নির্বাচনী আলোচনা করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ পরিস্থিতি

'ইরান' হইল প্রাচীন পারস্য। আনুমানিক ত্রি-সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের মূলভূমি হইতে চতুর্বেদ অনুসারী অগ্নি উপাসকগণের একাংশ উত্তর-পশ্চিমাংশে, পারস্যে গমন করেন। সেই স্থানে বসতি স্থাপন পূর্বক তাঁহারা এক উন্নত সভ্যতার সূচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামি আগ্রাসনের সম্মুখে স্বধর্মত্যাগে অসম্মত পারসিকদিগের একাংশ পুনরায় ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। কালক্রমে ইসলামের করালগ্রাসে চলিয়া যায় পারস্য। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইবার পর পারস্য বর্তমান 'ইরান'-এর রূপ পরিগ্রহ করে। বহু কাল যাবৎ ইরানে বলবৎ ছিল শাহ পাহলভি বংশের শাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়ে ইরানের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন মহম্মদ রেজা শাহ পাহলভি। ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হইবার পর জনপ্রিয় নেতা মহম্মদ মোসাদ্দেক ইরানের তৈলসম্পদ জাতীয়করণে উদ্যত হইলে প্রমাদ গোনে আন্তর্জাতিক লুণ্ঠতন্ত্রের ধারক-বাহকগণ। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁহাকে গদিচ্যুত করা হয়। ইহার পর ইরানে শাহ পাহলভির শাসনকাল অব্যাহত থাকিলেও ১৯৭৯ সালে এক অভূতপূর্ব ইসলামিক বিপ্লবের সাক্ষী থাকে ইরান। 'বিপ্লব' হিসাবে আখ্যায়িত হইলেও ইহা বাস্তবে ছিল এক ভয়ঙ্কর জেহাদি অভ্যুত্থান। এই তথাকথিত বিপ্লবের পশ্চাতেও ছিল বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মস্তিষ্ক ও ইন্ধন। শাহ পাহলভি পলায়ন করিবার ফলে ইরানের যাবতীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করে রুহুল্লা খোমেইনি। ইরানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আয়াতুল্লা রাজ'। নামমাত্র গণতন্ত্রে পর্যবসিত হয় ইরান। কঠোর ও নৃশংস মোল্লাতন্ত্রের ঘেরাটোপে জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা হয় অপহৃত। মন্ত্রীসভা থাকিলেও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লার হস্তেই দেশের সর্বপ্রকার ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। আন্তর্জাতিক প্রভুদের স্বার্থ রক্ষার্থে ১৯৮০ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয় ইরান। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় দুই দেশ। ১৯৮৯ সালে ইরানের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সৈয়দ আলি হোসেইনি খোমেইনি। ইহার পর তিনটি দশক অতিক্রান্ত হইয়াছে। পরমাণুশক্তিধর দেশ হইয়া উঠিবার লক্ষ্যে গোপনে প্রয়াসী হইয়াছে ইরান। তাহাদের এই পরিকল্পনায় যাবতীয় সহযোগিতা করিয়াছে চীন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া। ইরানের গোপন পরমাণু প্রকল্প পরিচালনায় ইজরায়েলের ভাগ্যাকাশে ঘনাইয়া উঠিয়াছে বিপদের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। ইরানি কট্টরপন্থী মজহবিদের চিন্তাধারা অনুসারে বিশ্বব্যাপী বিধর্মী নিধন না হইলে 'কেয়ামত' কোনোদিনই আসিবে না। ফলে বিশ্ব জুড়িয়া ইসলামের শাসন অধরাই রহিয়া যাইবে। ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে ইরানের প্রধান লক্ষ্য হইল— ইজরায়েল ধ্বংস ও ইহুদি নিধন। এহেন উদ্দেশ্যর সহিত যুক্ত হইয়াছে শিয়া-সুন্নির চিরকালীন দ্বন্দ্ব।

গোপন পরমাণু প্রকল্প ব্যতিরেকে মধ্যপ্রাচ্য জুড়িয়া বিভিন্ন ইসলামি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর গোপন মদতদাতা ইরান। তাহাদের সহযোগিতায় প্যালেস্তাইনে হামাস, লেবাননে হেজবোল্লা এবং ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিদের কার্যকলাপ দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যাহত রহিয়াছে। ইরাক ও সিরিয়াতে সক্রিয় বিভিন্ন শিয়া মিলিশিয়াকেও প্রত্যক্ষভাবে সমর্থনদান করিয়া থাকে ইরান। এইসবের মূল পরিকল্পনাকারী ইরানের সেনাপ্রধান কাসেম সোলেমানিকে ২০২০ সালে একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হত্যা করে মার্কিন সেনাবাহিনী ও ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'। ইহার কারণে ইরানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের শত্রুতা তুঙ্গে ওঠে। ইরানের ওপর কঠোর আর্থিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত বৎসরও ইরানের একাধিক গোপন পরমাণু কেন্দ্রে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই বৎসর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হইতে তাহাদিগের মধ্যে এক মহারণের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্যাপক ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াও আমেরিকা ও ইজরায়েলের প্রতিটি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দান করিতেছে ইরানের সেনাবাহিনী। রমজান মাসে এই যুদ্ধের আবহে সমগ্র পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলব্যাপী সংঘটিত হইতেছে সম্পদ ধ্বংস ও নরমেধ যজ্ঞ। ইরান কর্তৃক হরমুজ প্রণালী অবরোধ এবং উপসাগরীয় দেশসমূহের খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রে ক্রমাগত আক্রমণ সংঘটিত হইবার দরুন বিশ্বব্যাপী তীব্র হইয়াছে খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও হিলিয়াম গ্যাসের সংকট। ভারত সরকার প্রণীত ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য নীতি এবং ভারতের পরিণত কূটনৈতিক অবস্থানের কারণে অদ্যাবধি দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় গত ২২ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২৩ মার্চ ভারতের সংসদে তাঁর বক্তৃতায় সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীদিনে ইরান যুদ্ধ-উদ্ভূত সংকট বিশ্বব্যাপী 'নজিরবিহীন' আকার ধারণ করিতে পারে এবং এই যুদ্ধের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হইতে পারে বলিয়া নিজ বক্তব্যে ইঙ্গিত প্রদান করেন তিনি। এহেন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হইবার আহ্বান জানান।

সুভাষিতম্

গুণৈরুত্তমতা যাতি নোচ্চৈরাসনসংস্থিতঃ।
প্রাসাদশিখরস্থোঽপি কাকঃ কিং গরুড়ায়তে।। (চাণক্যনীতি)

অর্থ : শ্রেষ্ঠত্ব গুণ থেকে আসে, উচ্চাসন থেকে নয়। কাক প্রাসাদশিখরে বসলেও গরুড়পক্ষী হয়ে যায় না।

'ফল্টি লিডার'-এর হাত ধরে তৃণমূলের আগমনের মধ্যেই ছিল বিদায় বার্তা

'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল'

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হোরিখেলা' দিয়েই শুরু করলাম। আবারও লিখছি ২০১১-তে অত্যাচারী বিদেশি বামেদের সরাতে তৃণমূলের কোনো ভূমিকা ছিল না। চৌত্রিশ বছরের ভোট চুরি জোচ্চুরি আর অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছিল এসওয়াই কুরেশি-র নির্বাচন কমিশন। নিখুঁতভাবে ভোটার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে বিদেশি বামেদের নকল দুর্গ তারা ভেঙে দেয়। যেমন করছে জ্ঞানেশ কুমারের কমিশন। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সাবালক ছিল না। তবে তাদের নেতা-নেত্রীরা পরিবর্তনের আনন্দ চেটেপুটে খেয়েছিলেন। যাদের দয়ায় হয়েছিল রাজনৈতিক উত্থান, আজ তাদেরই বিরোধিতায় উন্মত্ত তৃণমূল। হয়তো রাজনৈতিকভাবে বিজেপি-র সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে অক্সিজেন খুঁজছে তৃণমূল।

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে চুরি-ডাকাতি, সরকারি কাজে বাধাদান-সহ ১৭টি অপরাধ ঘটানোর অভিযোগে ফৌজদারি মামলা হয়েছে। সুপ্রিম আদালতে তিনি ভৎর্সিত হয়েছেন। এরপরেও গা গুলানো প্রশ্ন উঠছে তদন্তকারী সংস্থা ইডি এই মামলা করতে পারে কি না। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কাজ বিদেশি বামেদের শাসনকালেও করেছেন তৃণমূলনেত্রী। তবে আশ্চর্যজনকভাবে পার পেয়ে যান। তিনি কখনও জেল বা পুলিশ হেফাজতে থাকেননি। আরও আশ্চর্যের যে এরকম একজন নেত্রীকে প্রায় ৪৫-৪৮ শতাংশ ভোটার গত পনেরো বছর ধরে সমর্থন করে চলেছেন।

নির্বাচন কমিশনের গুঁতোয় বর্তমানে তৃণমূলের প্রায়োন্মাদ অবস্থা। একদিকে ভাঙাচোরা আর জোড়াতাপ্পি মারা আধখাওয়া প্রার্থী তালিকা যা নিয়ে চতুর্দিকে বিক্ষোভ অন্যত্র নেত্রীকে বাঁচানোর নিরলস প্রয়াস। অনেকদিন থেকেই রাজ্যের মানুষের ভাগ্য বাজি রেখে জুয়া খেলছে তৃণমূল। কারণ বিজেপি-র জাহাজ তৃণমূলের ডিঙি নৌকোর কাছে চলে আসায় নৌকো এবার উলটে যেতে পারে। তৃণমূল সুপ্রিমো হলেন 'ত্রুটিপূর্ণ নেত্রী' বা 'ফল্টি লিডার'। পারিপার্শ্বিকতার ভিতর দিয়েই তার উত্থান। নেত্রী হতে যে পাঁচজন তাকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনই জীবিত। তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই সর্বত্র তৃণমূলত্রী ছিলেন ছায়া আর শুভেন্দুবাবু কায়া। ভবানীপুরের লড়াই প্রমাণ করবে কেন তৃণমূলনেত্রী ভুলক্রমে তৈরি হওয়া নেত্রী বা 'ফল্টি লিডার'। জ্যোতি বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় না হেরে বিদায় নিয়েছিলেন। বসুকে সরিয়ে দেওয়া হয় আর বিধান রায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ২০২৬-এর ভোট বিশেষ আকার ধারণ করেছে। তার কারণ তৃণমূলের অপশাসন। তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ। সে ঘড়া পরিষ্কার করতে গেলে বহু ধরনের ধর্মাচরণ করতে হবে। শ্রীভগবান মহাভারতে তাই করেছিলেন। তৃণমূলের অবান্তর দাবি হলো যে, কমিশন মেঘের আড়াল থেকে রাজ্য-রাজনীতির অংশ হয়ে উঠেছে। দাবিটা আজগুবি। সব ক্ষেত্রেই তা সর্বোচ্চ আদালতে অগ্রাহ্য হয়েছে। পাপে পূর্ণ ঘড়ার জল ফেলতে এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কমিশনকে ৭০ জন আমলাকে সরাতে হয়েছে। তারা প্রশাসনকে রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে পরিণত করেছিল। আড়াই হাজার বছর আগে আচার্য চাণক্য 'অমাত্য আর আমলা'দের গাভীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ রাজ্যে তারা সারমেয়তে পরিণত হয়েছেন। আর ঠিক তাই তাদের উপর কুঠার চালিয়ে ধার পরীক্ষা করছে কমিশন।

তৃণমূল পারিবারিক দল। যেমন কংগ্রেস। স্বাধীনতার প্রথম ৩০ বছরে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ছিল কংগ্রেস। ১৯৮০ থেকে বিজেপি-র পরীক্ষার মুখে পড়ে চার বছরের মধ্যে একক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ধ্বংস হয়ে যায় কংগ্রেস। ১৯৮৪-র পর কংগ্রেস এককভাবে কোনো জাতীয় নির্বাচন জেতেনি। ২০১১ সালের পর এই প্রথম প্রকৃত রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েছে তৃণমূল। তারা জনতার দল নয়— এই সত্যটা ভোটারকে বুঝতে হবে । একটা বিশেষ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে তাদের জন্ম। সে সময় তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ কোনো ব্যক্তি বা দল ছিল না। সেই সময় রাজ্যবাসীর লক্ষ্য ছিল— অত্যাচারী বিদেশি বামেদের অপসারণ। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি বিতাড়নের মতো। বামপন্থী সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটাতেই সব দল এক ছাতার তলায় আসে। তৃণমূল ফাঁকতালে তার নেতৃত্ব পেয়ে যায়।

গ্রামবাঙ্গলা তৃণমূলের দখলে রয়েছে— এ রটনা সর্বৈব মিথ্যা। ২০২১-এ কলকাতা শহর আর শহরতলির প্রায় ১০৮টি আসনের ওপরেই ভর করে তৃণমূল জিতেছিল। কলকাতা সংলগ্ন চারটি জেলায় বিজেপি প্রায় শূন্য হয়ে যায়। এবার সেই ১০৮ আসনই বিজেপি-র পাখির চোখ। তার ৪০ শতাংশ বিজেপি পেলে তৃণমূলকে নিয়ে লিখতে হবে— 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা।'

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ভোটে থার্ড আম্পায়ার !

ভীতসন্ত্রস্তেষু দিদি,

দিদি আমারও ভয় করছে। যা শুনছি তাতে তো ভোটে থার্ড আম্পায়ার নিয়োগ হচ্ছে। কী হবে দিদি, আপনি তো ইস্তাহারেও তেমন কিছু বলতে পারলেন না!

তৃণমূল কংগ্রেসের ২০২১ সালের ইস্তাহারের কথা আমার মনে পড়ছিল। কারণ, সবাই বলছে এবারে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে এত এত ঢপবাজি রয়েছে যে রাস্তাঘাটে মানুষও তা বিশ্বাস করছে না। আগের বারে বলেছিলেন, প্রতি বছর ৫ লাখ করে চাকরি দেবেন। দেননি কিছুই। বলেছিলেন, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড দেবেন। কিন্তু কথাই সার, কাজের কাজ হয়নি। উলটে নিয়োগ দুর্নীতি, ঘুষ নিয়ে চাকরির কলঙ্ক। বলেছিলেন, ১.৫ কোটি পরিবারকে দুয়ারে রেশন পরিষেবা দেবে। হয়নি। হয়েছে রেশন দুর্নীতি।

বলেছিলেন, ৬৮ লক্ষ কৃষককে প্রতি একর জমি পিছু ১০ হাজার টাকা দেবেন। কিন্তু কী হয়েছে কে জানে! বলেছিলেন, কৃষি ক্ষেত্রের বিস্তার হবে, উৎপাদনশীলতা বাড়বে। কিন্তু চাষের জমিতে সেচের জলই দিন দিন কমছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কী হলো!

বলেছিলেন, রাজ্যে ২ হাজার বড়ো শিল্প আসবে। যার কিচ্ছুটি হয়নি। বলেছিলেন, ৫ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ আসবে, কিছুই আসেনি। বলেছিলেন, চিকিৎসার সুবিধা বাড়াবে। কিন্তু হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব। বলেছিলেন, প্রতিটি ব্লকে মডেল আবাসিক স্কুল হবে। হয়নি। এবারে আবার যা যা বলা হয়েছে সেটাকে ইস্তাহার না বলে লোকে ঢপহার বলছে দিদি।

এবার থার্ড আম্পায়ারের কথা বলি দিদি। কমিশন সূত্রে যা শুনছি ও বুঝছি, এবারের ভোটে থার্ড আম্পায়ারের ভূমিকা হবে সবচেয়ে বেশি। থার্ড আম্পায়ার, মানে ঠিক ক্রিকেট মাঠের মতো। চোখে দেখা যাবে না, কিন্তু তাঁদের চোখ দিয়ে পুরো খেলা মানে ভোট প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখবে কমিশন। সেটা কী রকম বলব?

বুঝলেন তো! একটু এদিক-ওদিক হলেই ফের নির্বাচন। আবার ভোটগ্রহণ। আর পরে ভোটগ্রহণ মানে সেই সব বুথে একেবারে মশা গলতে পারবে না এমন ব্যবস্থা করে হবে ভোট। আর সেই সব সিদ্ধান্ত নেবেন থার্ড আম্পায়াররা। তাঁরা প্রায় সকলেই আসবেন ভিন রাজ্য থেকে। আড়ালে বসে সবটা দেখবেন আর সিদ্ধান্ত নেবেন।

তাঁদের কাজ হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর নজরদারি। নজরদারদের উপর নজরদারি। পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই অভিযোগ, বাহিনী আসে বটে, কিন্তু তাঁদের বসিয়ে রাখা হয়। অথবা অভিযোগ, কামিনী-কাঞ্চন দিয়ে তাঁদের বসদের আরামের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। গরমের সময়ে বিনা পয়সায় ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। যে পানীয় শরীর ঠাণ্ডা করে, মন ঠাণ্ডা করে, চোখ লাল করে, চোখ ঢুলু ঢুলু করে।

এই সব অভিযোগ শুধু রাজনৈতিক নেতাদের নয়। সাধারণ মানুষেরও। তাই এসব নিয়ে দিল্লির নির্বাচন সদনে বিস্তর চর্চা হয়েছে। তারপরই ঠিক হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং তাঁদের সব বসের গাড়িতে এবার জিপিএস ট্র্যাকার লাগানো হবে। রাজ্যের সব বুথ, সেক্টর অফিস, স্ট্রং রুম, নির্বাচনী আধিকারিকদের অফিস, সংলগ্ন জনপদ এবং রাস্তা-গলি-লেন-বাইলেন, সব ম্যাপ করা হবে। এআই প্রযুক্তির সাহায্যে এরপর চলবে নজরদারি। বেচাল দেখলেই এআই সতর্ক করবে মেঘের আড়ালে থাকা সেই থার্ড আম্পায়ারদের। সেই থার্ড আম্পায়ারদের সাহায্য করতেও থাকবে বড় আম্পায়ার এআই। ভুল দেখলে সতর্ক করবে। তাকে ম্যানিপুলেট করা যায় না।

এবার আর ভোটারের কান্না নয়, গোলমাল পাকায় যারা তাদের কান্নার দিন। ভাল খেললে কিছুই হবে না। নিয়ম ভাঙলে হলুদ কার্ডের ব্যবস্থা নেই। সোজা রেড কার্ড।

এবার ১০০ বুথে ওয়েব ক্যামেরা লাগানো হবে। সে তো প্রত্যেকবার বহু বুথেই লাগানো হয়। নতুন কী ? কিন্তু অভিযোগ, অনেক ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তার কেটে দেওয়া হয়, রেকর্ডিং মুছে দেওয়া হয়। এবছর কমিশন তা নিয়েও সতর্ক। ঠিক হয়েছে, সব বুথেই নাকি ২ টি ক্যামেরা থাকবে। একটি বুথের মধ্যে। অন্যটি ঠিক বুথে ঢোকার মুখে ভোটারদের লাইনে। সমস্ত ক্যামেরার লাইভ ফিডের উপর চলবে নজরদারি। এক্ষেত্রেও এআই প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে কমিশন। সন্দেহজনক কিছু ঘটলেই, এআই প্রযুক্তি সতর্কবার্তা পাঠাবে। প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছাড়া আর অন্য কোনও কারণে, ক্যামেরার লাইভ কাস্টিংয়ে কোনও গড়বড় হলে, ভোট স্থগিত করার কথা বলবে। সোজা পুনর্নির্বাচনের পরিস্থিতি বলে জানাবে এআই। সেই মতো নির্দেশ দেবে কমিশন।

ভোটের মাঠে তাই হ্যান্ড বল, ফাউল চলবে না। কেউ এগিয়ে গিয়ে অফসাইডে গোল করে চলে আসবে তার উপায় নেই। সব দেখে ফেলবে এআই নির্ভর প্রযুক্তি। তাই এবার আর ভোটারের কান্না নয়, গোলমাল পাকায় যারা তাদের কান্নার দিন। ভাল খেললে কিছুই হবে না। নিয়ম ভাঙলে হলুদ কার্ডের ব্যবস্থা নেই। সোজা রেড কার্ড।

আমার চিন্তাটা কোথায় জানেন দিদি, আপনি বা আপনার ভাইয়েরা তো সুষ্ঠু ভাবে ভোটে কী করে জিততে হয় সেটাই ভুলে মেরেছে। এখন কী হবে বলুন তো! □

অতিথি কলম

অমোল পেডণেকর

চক্রব্যূহে আটকে পড়েছে আমেরিকা

যুদ্ধ শুরু করা সহজ, কিন্তু তা শেষ করা খুব কঠিন। পশ্চিম এশিয়ায় যে পরিস্থিতি এখন চলছে, তা এই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে।

মহাভারতে অভিমন্যুর প্রসঙ্গ খুবই করুণ। বীর অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু বাইরে আসার বিদ্যা তাঁর জানা ছিল না। পশ্চিম এশিয়া আবার একবার যুদ্ধের ভীষণ আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। আমেরিকা, ইজরায়েল আর ইরানের মধ্যে গত প্রায় এক মাস ধরে চলা যুদ্ধ এক ব্যাপক কৌশলগত সংঘর্ষের রূপ বলে মনে হচ্ছে। প্রথমদিকে যে যুদ্ধকে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সীমিত সামরিক পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল, সেই যুদ্ধ এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতি,তৈলসম্পদ সুরক্ষা এবং বৈশ্বিক শক্তি ভারসাম্যকে প্রভাবিত করছে। ইতিহাসে অনেকবার এমন হয়েছে যে, যুদ্ধের শুরুতে শক্তিশালী দেশগুলো মনে করেছিল যে তারা জয়লাভ করবে, কিন্তু যত সময় এগিয়েছে তত আসল সত্য সামনে আসতে শুরু করেছিল। বর্তমান সংঘর্ষেও এরকমই কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকা সম্ভবত ইরানের সামরিক শক্তি এবং তাদের কৌশলগত ধৈর্যকে দুর্বলতা মনে করেছিল। ফলে এখন পরিণতি এমন দিকে যাচ্ছে যে আমেরিকা ক্রমশ এক জটিল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ছে। যেখানে প্রতি পদক্ষেপে ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। এই যুদ্ধ শুধু দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ নয়। এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য, জ্বালানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতি ও সামরিক শক্তির প্রতিষ্ঠার বিষয়।

এই যুদ্ধের পটভূমি গত কয়েক বছর ধরে তৈরি হচ্ছিল। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন এবং পশ্চিম এশিয়ায় তাদের ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্রিয়তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল দীর্ঘদিন ধরে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, ইরান পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে, ইরানও ক্রমাগত দাবি করে চলেছে যে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল তৈল উৎপাদন ও বৈজ্ঞানিক বিকাশের জন্য। উত্তেজনার এই পরিবেশ তখনই যুদ্ধে পরিবর্তিত হয়েছে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরানের কিছু সৈন্য ও সামরিক ঘাঁটির ওপর ব্যাপক বিমান হানা শুরু করে। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার, ইরানের সামরিক কাঠামো দুর্বল করা, তার মিসাইল ও ড্রোন নেটওয়ার্ক নষ্ট করা এবং তাকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা। প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েরে বিশ্বাস ছিল যে, তাদের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব, আধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থা এবং ব্যাপক গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তাদের সাফল্য এনে দেবে। কিন্তু যুদ্ধের ১৫ দিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ইরান তার চিরাচরিত যুদ্ধের বদলে 'বুদ্ধির অগম্য' কোনো যুদ্ধনীতি প্রয়োগ করে চলেছে।

ইরানের এই নয়া যুদ্ধনীতি আমেরিকাকে নাজেহাল করে রেখেছে। ইরনের সামরিক কৌশলের মৌলিক নীতি হলো, তারা চিরাচরিত যুদ্ধ পদ্ধতিতে একমহাশক্তিধর দেশকে আঘাত করার পরিবর্তে এমন রণনীতি গ্রহণ করেছে, যা বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে ফেলবে। এই কারণে ইরান এই যুদ্ধে ব্যালেস্টিক মিসাইল, নেভাল মাইন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সহযোগী সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করছে। ইরানের উদ্দেশ্য শুধু মার্কিন সামরিক বাহিনীর ক্ষতিসাধন করাই নয়, উপরন্তু দীর্ঘ ও অস্বস্তিকর যুদ্ধে আমেরিকাকে জড়িয়ে ফেলা। যুদ্ধবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ' বলা হয়। যেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ তার দুর্বলতার সীমা অনুধাবন করে এমন এক রণনীতি গ্রহণ করে যা শক্তিশালী শত্রুর ক্ষমতা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ইরান তার প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, তার ওপর যদি চাপ সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে পুরো পশ্চিম এশিয়াকে অশান্ত করে তুলতে পারে। এরই কৌশল হিসেবে সে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি এবং সমুদ্র-বাণিজ্য পথের ওপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই কারণেই হরমুজ প্রণালী যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হতে দেখা যাচ্ছে।

এই যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক কেন্দ্র হলো হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের প্রায় পাঁচভাগ তৈলসম্পদ এই জলপথ দিয়ে যায়। যদি এই পথটি বিঘ্নিত হয়, তাহলে আবিশ্ব তেল সরবরাহের ওপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে। ইরান দীর্ঘদিন থেকে ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে যে, যদি তার বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ হয় তাহলে সে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে। যুদ্ধের এই প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও পথটি বন্ধ হয়নি, কিন্তু ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা বিশ্ববাজারকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে।

আমেরিকা এবং তার মিত্র দেশগুলি হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য নৌবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সমুদ্রযুদ্ধের এই অঞ্চল অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল। ছোটো ছোটো নৌকা, নেভাল মাইন এবং ড্রোনের মতো প্রযুক্তিগুলি বড়ো বড়ো রণতরীগুলিকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। এই কারণেই এই যুদ্ধ শুধু বিমানযুদ্ধের মধ্যে সীমিত না থেকে সামুদ্রিক শক্তি পরীক্ষার যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।

ইরানের অর্থনীতি মূলত তেল রপ্তানির

ওপর নির্ভরশীল। এই পরিদৃশ্যে খার্গ দ্বীপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বীপটি ইরানের তেল রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। যদি এর পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ইরানের অর্থনীতিতে বড়ো ধাক্কা লাগতে পারে। মার্কিন রণবিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে হলে খার্গ দ্বীপে আঘাত হানা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু এই পদক্ষেপে একটি বড়ো ঝুঁকি রয়েছে। ইরানের তেল সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে উপসাগরীয় দেশগুলোর তৈলপ্রতিষ্ঠানগুলি আমেরিকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। তার ফলে বৈশ্বিক তৈলবাজারে বড়ো রকমের অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

এই যুদ্ধের ১৫দিনের মাথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে তিনটি বড়ো চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। প্রথমটি হলো আঞ্চলিক সমর্থনের অনিশ্চয়তা। আমেরিকার অনেক বন্ধুদেশ এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। এর কারণ হলো, এই যুদ্ধ যেকোনো সময় ব্যাপক আঞ্চলিক সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো, ইরানের ধীরস্থির রণকৌশল। ইরান কিন্তু এখনো পুরোপুরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। সে সীমিত কিন্তু প্রভাবী প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে আমেরিকাকে ব্যতিব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হলো, বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। আমেরিকা নিজেকে বিশ্বের প্রধান শক্তিধর দেশ হিসেবে জাহির করে থাকে। এই যুদ্ধে যদি সে প্রত্যাশিত সাফল্য না পায়, তাহলে তার সেই ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। মহাকাব্য মহাভারতে অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশ এপ্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য। অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু তা থেকে তাঁর বাইরে আসার কৌশল জানা ছিল না। ফলে তাঁকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। আসলে তিনি চক্রব্যূহে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে কয়েকজন বিশ্লেষক মনে করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহে ফেঁসে গিয়েছে। যুদ্ধের প্রথমদিকে আমেরিকার বিশ্বাস ছিল যে, সামরিক শক্তিবলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের নতুন নতুন ফ্রন্ট খুলে যাচ্ছে।

আমেরিকা যদি এই যুদ্ধকে আরও বাড়িয়ে চলে, তাহলে পুরো পশ্চিম এশিয়ার গায়ে যুদ্ধের আঁচ লাগতে পারে। যদি সে পিছিয়ে আসে তাহলে সারা বিশ্বে তার নাক কাটা যাবে। আর যদি সে আপোশ করে তাহলে ইরান তার কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে ঘোষণা করবে। এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনটি বড়ো সম্ভাবনা সামনে এসেছে। প্রথম সম্ভাবনা হলো, কিছু সময় পরে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই যুদ্ধকে সীমিত করা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দুই পক্ষই নিজের নিজের শর্তানুসারে যুদ্ধবিরাম ঘোষণা করতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো, এই যুদ্ধ আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিবর্তিত হতে পারে। যদি লেবানন, ইয়েমেন বা অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠন এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। তৃতীয়টি হলো, এই যুদ্ধ আবিশ্ব আর্থিক সংকটের কারণ হতে পারে। যদি তেল সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এবং সমুদ্রপথ অসুরক্ষিত থাকে, তাহলে বিশ্বময় অর্থ-ব্যবস্থার ওপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে। তাই এই যুদ্ধ কেবল দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও এক নতুন সংকটের কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

গত কয়েক বছর থেকে আলোচনা চলছে যে, বিশ্ব এখন আর এক মেরুর নয়, ধীরে ধীরে বহু মেরু দিকে এগিয়ে চলেছে। এই যুদ্ধে যদি আমেরিকা তার প্রত্যাশিত সাফল্য না পায়, তাহলে রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য উদীয়মান শক্তিগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গেই তেল সুরক্ষার প্রশ্নও বিশ্ব রাজনীতির মূল বিষয় হয়ে যেতে পারে।

ভারতের মতো তেল আমদানিকারক দেশের পক্ষে এই যুদ্ধ খুবই চিন্তার বিষয়। ভারতের অর্থব্যবস্থা অনেকাংশে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি আমদানির নির্ভরশীল। যদি পশ্চিম এশিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে অশান্তি বজায় থাকে, তাহলে এর প্রভাব ভারতের আর্থিক উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বিদেশনীতির ওপরও পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি গ্রহণ করতে হবে — একদিকে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং অন্যদিকে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধ শুধু এক যুদ্ধ নয়, এটি একবিংশ শতাব্দীর শক্তি প্রদর্শনের রাজনীতি, তৈল সম্পদ এবং বৈশ্বিক রণনীতির এক পরীক্ষা। যুদ্ধের ১৫ দিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, এই যুদ্ধ দ্রুত বিজয়ের কাহিনি হয়ে উঠবে না। এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী এবং যথাসম্ভব আগামী বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার পদধ্বনিও শোনা যাবে।

ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যুদ্ধ শুরু করা সহজ, কিন্তু তা শেষ করা খুব কঠিন। পশ্চিম এশিয়ায় যে পরিস্থিতি এখন চলছে, তা এই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে। সঠিক কূটনীতি প্রয়োগে সময় থাকতেই যদি এর বিরতি ঘটানো না যায়, তাহলে এই যুদ্ধ কেবলমাত্র আঞ্চলিক সংকটেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার পক্ষে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করতে পারে।

(লেখক হিন্দি বিবেক পত্রিকার সিইও)

শোক সংবাদ

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সৎসঙ্গ প্রমুখ, বিশ্ব হিন্দু বার্তা ও স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি ভাস্কর দাসের মাতৃদেবী মল্লিকা দাস গত ১৭ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলার দুবরাজপুর খণ্ডের সহ খণ্ডকার্যবাহ বিমলেন্দু মণ্ডলের পিতৃদেব হারাধন মণ্ডল গত ২২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও ২ নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা মহানগরের পূর্বতন সঙ্ঘচালক সুশীল কুমার রায়ের সেজদা শ্যামপুকুর শাখার স্বয়ংসেবক সন্তোষ কুমার রায় গত ১৯ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে

গত এক বছর ধরে ইরানের আয়াতুল্লারা তাদের ভয়ঙ্কর শাসন ধরে রাখতে প্রায় ৫০ হাজার নিরীহ ইরানি নাগরিককে হত্যা করলেও বঙ্গ মিডিয়া চুপ ছিল। চুপ থাকার কারণ হিসেবে তাদের বক্তব্য হলো ওটা ওদের দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ইহুদিদের মা-বোন, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হামাস গণহত্যা করলে, পণবন্দি বানালে, সেই পণবন্দিদের ছাড়াতে ইজরায়েল গাজায় সামরিক অপারেশন চালালে, গাজার জন্য চোখের জল ফেলতে কলকাতার রাস্তায় নামে হাজার হাজার 'বাঙ্গালি'। নিজেদের দেশের নাগরিককে হত্যা করা কোনো অপরাধ নয়? কোনো দেশের মা-বোনেদের জেহাদিরা তুলে নিয়ে গেলে তাঁদের রক্ষা করতে যুদ্ধ করা অপরাধ? রামায়ণ-মহাভারতের যুগে শ্রীরামচন্দ্র বা পাণ্ডবরা কি তাহলে ভুল করেছেন? আসলে স্তালিন, মাও, পল পট, চেসেস্কু থেকে শুরু করে প্রত্যেক কমিউনিস্ট শাসক যখন তাদের দেশের নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করে, তখন এই তথাকথিত বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীর দল চুপ থাকে, অথচ হিটলার তার শত্রু মারলে সে বড়ো পাপী। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ৩০ লক্ষ বাঙ্গালিকে না খাইয়ে হত্যা করলে বাঙ্গালি সেটা মাফ করে দেয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দোহাই দিয়ে ইতিহাস বই থেকে ইতিহাসের ওই অন্ধকার অংশ বাদ দেয়। সুরাবর্দি কয়েক হাজার বাঙ্গালিকে হত্যা করলে বামপন্থী সাংবাদিক, ইতিহাসবিদদের কাছে সেটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে নেতানিয়াহু শত্রুপক্ষকে হত্যা করলে তারা রে-রে করে তেড়ে আসে!

আরেক দল বলছে, ইরান নাকি ভারতের বন্ধু। কারণ তারা ভারতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে। প্রশ্ন হলো, ইরান কি কখনও ভারতকে বিনা পয়সায় তেল বা গ্যাস দিয়েছে? নাকি কম দামে দিয়েছে? মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে 'ডলার' যেহেতু তারা ব্যবহার করতে পারে না এবং যেহেতু তাদের খনিজ তেল রপ্তানির ওপরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে, সেহেতু তারা বাধ্য হয়ে কম দামে তেল বিক্রি করতে খরিদ্দার সন্ধান করেছে এবং তাদের ক্রেতাদের সবাইকেই কম দামে কিছুটা তেল বিক্রি করেছে। তো এটা কীসের বন্ধুত্বের নমুনা? তাহলে জিনিসপত্র দরদাম করে যাদের থেকে কেনাকাটা হয় সেই বড়বাজারের সাহু, মিষ্টির দোকানের মালিক, বাজারের সবজির দোকানদার, পাঁঠার মাংস কাটার কসাই সবাই আমাদের বন্ধু! এইসব ছেঁদো কথা চায়ের দোকানে বললে ঠিক আছে। কিন্তু নামি সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয়তে বা ইউটিউবের 'জ্ঞানগর্ভ' আলোচনায় এই মূর্খামি কেন? নাকি সাধারণ মানুষকে মূর্খ বানাতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এই ভণ্ডামি?

এবার আসা যাক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ১৯৭১-এর পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৭৪ ও ১৯৯৮-এ পোখরানে ভারতের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা, ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধ— কোনো ক্ষেত্রেই ইরান কিন্তু ভারতের পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু সবরকম পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে ছিল ইজরায়েল। জম্মু-কাশ্মীরে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা-সহ সব ক্ষেত্রেই ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে ইরান। বহুবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ভূমিকার তারা প্রকাশ্য সমালোচনা করেছে, এমনকী ভারতে ইসলামোফোবিয়া, কাশ্মীর-সহ নানা ইস্যুতে তারা অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হয়নি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন ভোটাভুটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ভোট পর্যন্ত দিয়েছে। পরোক্ষে তারা আর্থিক ও সামরিক মদত দিয়েছে কাশ্মীরি জেহাদিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পরবর্তীকালে রাশিয়া ভারতের সঙ্গে থাকলেও, ইরান কোনো কিছুরই পরোয়া করেনি।

বর্তমানে সংসদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় বিরোধী পক্ষের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে ভূ-রাজনীতি বোঝেন এমন একজনই রয়েছেন। তিনি হলেন শশী থারুর। উনি বলেছেন যে, পাশের বাড়ির যুদ্ধের বিষয়ে আমরা কেন মাথা গলাবো? যখন ১৯৯৩-এর মুম্বই বিস্ফোরণ হয়, ইরান ভারতের পাশে ছিল? ২৬/১১-র আক্রমণের পর ইরান কি ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিল কিংবা টানা কয়েক দশক কাশ্মীরে যখন জঙ্গিরা নিরীহ কাশ্মীরি পণ্ডিত ও বাল্মীকিদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছিল, কোথায় ছিল আয়াতুল্লারা?

আর সবচেয়ে বড়ো কথা— ইরান, পারসিক সভ্যতা ও আয়াতুল্লাদের শাসন এক জিনিস নয়। ইরানের মানুষকে মিথ্যা ইসলামি জাতীয়তার স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁদের ওপর গত ৪৮ বছর ধরে নৃশংস অত্যাচার করেছে এই আয়াতুল্লারা। দেশের প্রেসিডেন্ট, বিদেশমন্ত্রী নামে থাকলেও তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা এই আয়াতুল্লা নামধারী মোল্লাতন্ত্রের হাতে কুক্ষিগত। গণতন্ত্র ওখানে একটা মস্ত বড়ো ধোঁকা। ইরানের ৯ কোটি মানুষ যদি এই যুদ্ধে মুক্তি পায়, স্বাধীনতা পায় তাহলে ক্ষতি কী?

অনেকে বলছেন, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের আকাল দেখা দিলে কী হবে? ১৯৭৩ ও ১৯৯০-তে উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কী হয়েছিল এবং এবার কী হয়েছে সেটা তাহলে একবার তুলনা করা যাক। ১৯৭৩-এ ইজরায়েল-আরব যুদ্ধের প্রভাবে ভারতের জিডিপি ১ শতাংশে নেমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে হয় ২৯ শতাংশ। পরের দু'বছর দেশে চূড়ান্ত বেকারত্ব দেখা যায় এবং মানুষের ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচতে ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হন জরুরি অবস্থা জারি করতে। সোভিয়েতকে খুশি করাও অবশ্য অন্যতম কারণ ছিল। ১৯৯০-তে আমেরিকা-ইরাক যুদ্ধের সময় ভারত আমেরিকাকে যুদ্ধের জন্য এদেশ থেকে তেল নিতে অনুমতি দেয় এবং তার পরিবর্তে আইএমএফ থেকে পায় প্রচুর অর্থ। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রশেখর। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারকে বাইরে থেকে কংগ্রেসি সাংসদদের সমর্থন দিচ্ছিলেন রাজীব গান্ধী। সেখানে এবার ইজরায়েল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো সরাসরি সাহায্য করেনি ভারত সরকার। যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়েনি। ইউরোপে যেখানে গ্যাসের দাম বেড়েছে ৮৫ শতাংশ, সেখানে ভারতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ।

ফলে যুদ্ধে কোনো পক্ষ না নেওয়া ভারত সরকারের একটা বড়ো ভূ-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং যদি এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা তাদের দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে বিরোধী দল বা কলকাতার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, আঁতেল সাংবাদিক ও বামপন্থী ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদদের এই বিষয়ে টিপ্পনী করার কোনো অধিকার নেই। □

ইরান, আমেরিকা, ইজরায়েলের দ্বন্দ্ব

খোমেইনির মৃত্যুতে ভারতের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মাথাব্যথা কেন?

বরুণ মণ্ডল

বিশ্বরাজনীতির অস্থির সময়ে একটি মৌলিক প্রশ্ন নতুন করে সামনে আসে। তাহলো ভারতের মতো একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশে বিদেশের সংঘাত নিয়ে রাস্তায় নেমে আবেগতাড়িত প্রতিবাদ কি সত্যিই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে, নাকি অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে দুর্বল করে? সাম্প্রতিক ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকা উত্তেজনার প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা খোমেইনির হত্যার পর আন্তর্জাতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ইজরায়েলি মিসাইল হামলার কারণে খোমেইনি নিহত হন। এই ঘটনার পর ভারতের মুসলমানরা কিছু অঞ্চলে প্রতিবাদ মিছিল করেছে। বিশেষত কাশ্মীর উপত্যকায় শ্রীনগরে হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে বিক্ষোভ হয়েছে, যেখানে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করেছে এবং কয়েকজন আহত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, যা বিভিন্ন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য কী? ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করা, নাকি আবেগের বহিঃপ্রকাশ? এবং এই আবেগ কি ভারতের নিজস্ব জাতীয় অগ্রাধিকারকে ছাপিয়ে যাচ্ছে না?

এখানে আরও একটি উদ্বেগজনক দিক উঠে আসে এই প্রতিবাদগুলোর মধ্যে দিয়ে। যারা খোমেইনি হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে, তারা কাশ্মীরি হিন্দু বিতাড়নের (১৯৯০-এর দশকে প্রায় ৩ লক্ষ হিন্দুকে বাধ্য করে ছাড়তে হয়েছে) সময় পথে নামেনি; পুলওয়ামা জঙ্গি হামলার (২০১৯ সালে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান নিহত) ঘটনায় নীরব ছিল, কামদুনি নৃশংসতার (২০১৩ সালে এক কিশোরী নির্যাতিতা ও হত্যা) বিরুদ্ধে মিছিল করেনি এবং সম্প্রতি পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার (২০২৫ সালে ২৬ জন হিন্দু পর্যটক নিহত) প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এদের নীরবতা নিয়ে ভারতীয় সেলিব্রিটিরা তীব্র সমালোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বলেছেন, 'বলিউড তারকারা প্যালেস্তাইন বা ইরানের জন্য দ্রুত কণ্ঠস্বর তোলে, কিন্তু ভারতের সৈনিক বা কাশ্মীরি হিন্দুদের উপর হামলায় চুপ। এরা শুধু নির্দিষ্ট কিছুক্ষেত্রে ক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং এটাই এদের লুকানো অ্যাজেন্ডা।' একইভাবে, দ্য কাশ্মীর ফাইলস্-এর পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী উল্লেখ করেছেন, 'কাশ্মীরে কয়েক লক্ষ হিন্দুকে বিতাড়নের সময় এবং পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৪০ জন ভারতীয় সৈনিককে হত্যার সময় যারা নীরব ছিল, তারা আজ বিদেশি নেতার জন্য রাস্তায়। এদের নির্বাচিত ক্ষোভ প্রদর্শন ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর।' তাদের এই প্রতিবাদ শুধু আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং অভ্যন্তরীণ বিভাজনের বিপদ সংকেত।

> ইরান-আমেরিকা-ইজরায়েলের দ্বন্দ্বে ভারতের জনতার মাথাব্যথা হওয়া একটি মানবিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু সেটি যেন জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে না ওঠে।

ভারত একটি বিবিধতার দেশ। এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে নাগরিক দায়িত্বের একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্যও জড়িত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত সবসময়ই তার কৌশলগত অবস্থান বজায় রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনা প্রসঙ্গে সংযম, সংলাপ ও কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। কারণ, উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় ৮ মিলিয়ন (৮০ লক্ষ) ভারতীয় কর্মরত। তাদের মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইজরায়েলে হাজার হাজার শ্রমিক রয়েছে, যাদের নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বার্থ ভারতের কাছে অগ্রগণ্য। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালে সৌদি আরব থেকে ১৩ হাজারেরও বেশি ভারতীয় শ্রমিককে ডিপোর্ট করা হয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার অন্যতম সূচক।

ইরান প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দীর্ঘদিনের বিতর্ক রয়েছে। মার্কিন প্রশাসন ১৯৮৪ সাল থেকে ইরানকে 'স্টেট স্পনসর

ফঃ ২

অব টেররিজম' তালিকাভুক্ত করে রেখেছে। বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে যে, ইরান হিজবুল্লা বা হামাসের মতো গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। যদিও ইরান এসব অভিযোগ অস্বীকার করে এবং এগুলিকে আঞ্চলিক প্রতিরোধ রাজনীতির অংশ বলে ব্যাখ্যা করে। তবুও বাস্তব সত্য হলো, এই সংঘাতের অভিঘাতে ভারতের মতো দেশকে নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে হবে, বিশেষ করে যখন দেশটি ইতিমধ্যে সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের শিকার। ভারতের বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী সেই অবস্থানই নিয়ে চলেছেন।

একইসঙ্গে ইজরায়েলের অবস্থানও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য। ১৯৪৮ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে ইজরায়েল তার নিরাপত্তা প্রশ্নে আপোশহীন নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব বহু দশক ধরে ছায়া-সংঘাতের আকারে চলমান, যা ২০২৬-এর হামলায় নতুন মাত্রা লাভ করেছে। কিন্তু এই সংঘাতের সরাসরি পক্ষে নয় ভারত। ফলে ভারতীয় নাগরিকদের প্রশ্ন হওয়া উচিত, তাদের ভূমিকা কি মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিসংঘাতে জড়িয়ে পড়া, নাকি নিজেদের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষা করা?

এখানে আরেকটি দিকও গুরুত্বপূর্ণ। মজহবি আবেগ কখনও কখনও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে মিশে গিয়ে স্থানীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৪ সালে একটি মজহবি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য— যেখানে তিনি অমুসলমানদের দুর্ভাগা বলে অভিহিত করে ইসলামের পতাকাতলে আনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তা দেখিয়েছে মজহবি পরিচয় নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য কত দ্রুত মেরুকরণের কারণ হতে পারে। পরে তিনি বক্তব্যের ব্যাখ্যা পালটে দুঃখপ্রকাশ করলেও ঘটনাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ভারতের সর্বপন্থনিরপেক্ষ কাঠামো কতটা সংবেদনশীল ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে। এই মজহবি আবেগের প্রেক্ষাপটে সেলিব্রিটিদের বক্তব্য আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ইরানিয়ান-ভারতীয় অভিনেত্রী মান্ডনা কারিমি খোমেইনি হত্যার প্রতিবাদ দেখে বলেছেন, 'ভারতে নিরাপদে থেকে ইরানের শাসনের পক্ষে প্রতিবাদ দেখে আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ। এই শাসনের যখনই অবসান হবে, আমি ইরানে ফিরে যাব। এই ধরনের ভারতীয়রা আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে মনে হচ্ছে।' অভিনেত্রী ইয়ামী গৌতমও যোগ করেছেন, 'ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের এই প্রতিবাদ মিছিল দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে। তারা কিন্তু কাশ্মীরি হিন্দুদের দুর্ভোগে সমবেদনা জানায়নি।' এসব বক্তব্য ধর্মীয় আবেগের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

আবার, ইসলামি বিশ্বও একমুখী নয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক উত্তেজনা দেখায় যে, তথাকথিত মজহবি ঐক্য বাস্তবে কত জটিল ভূরাজনৈতিক স্বার্থে বিভক্ত। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক মুসলমান রাজনীতি নিজেই বহুস্তরীয় ও পরস্পরবিরোধী। তাহলে ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষে কোনো অন্য এক দেশের পক্ষে এমন অবস্থান নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিসংখ্যান। গত এক দশকে (২০১৬-২০২৫) কাশ্মীর-সহ জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মোট ২,৫৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬৬ জন সাধারণ নাগরিক, ৫৫১ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং ১,৬৩৯ জন সন্ত্রাসবাদী। এছাড়া, রয়েছে চোরাচালান, অনলাইন র‍্যাডিক্যালাইজেশন ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক। এসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতকে অভ্যন্তরীণ সংহতি আরও মজবুত করতে হবে। বিদেশের সংঘাতে মিছিল বা স্লোগান যদি স্থানীয় উত্তেজনা বাড়ায়, তবে তা অজান্তেই নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে সেলিব্রিটিদের সমালোচনা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যেমন অক্ষয় কুমার, রবিনা ট্যান্ডন এবং আল্লু অর্জুনের মতো তারকারা পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করলেও প্রো-ইরান মিছিলের মধ্যে দিয়ে ঘনিয়ে ওঠা বিপদ সম্পর্কে তাদের নীরবতা নিয়ে নেটিজেনরা তাদের 'সিলেক্টিভ' আখ্যা দিয়েছে। সাধারণভাবে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সমালোচনা হয়েছে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে 'প্যালেস্তাইন বা ইরানের জন্য দ্রুত কণ্ঠস্বর, কিন্তু ভারতে সন্ত্রাসী হামলায় চুপ— এটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।' এই নির্বাচিত প্রতিবাদ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রীতিমতো বিপজ্জনক।

তবে এর মানে এই নয় যে, আন্তর্জাতিক অন্যায় বা মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে মতপ্রকাশ করা যাবে না। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকরা বিশ্বরাজনীতি নিয়ে মতামত দিতেই পারেন। কিন্তু সেই মতামত যেন ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধ--- পন্থনিরপেক্ষতা, আইনের শাসন ও জাতীয় ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ না করে। প্রতিবাদ যদি অন্য দেশের প্রতি আনুগত্যের ভাষা ধারণ করে, তবে তা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়বে। কারণ, নাগরিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি ভারতীয় সংবিধান, কোনও বিদেশি মতাদর্শ নয়।

ভারতের শক্তি তার বৈচিত্র্যে। এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ— সবাই সমান অধিকারের নাগরিক। আন্তর্জাতিক সংঘাতের আবেগ যদি অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে উসকে দেয়, তবে লাভবান হবে— না ইরান, না ইজরায়েল; ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারত নিজেই। ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট— আলাপ-আলোচনা, শান্তি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। সেই অবস্থানকে সম্মান জানানোই প্রকৃত দেশপ্রেম।

স্বাভাবিকভাবেই ইরান-আমেরিকা-ইজরায়েলের দ্বন্দ্বে ভারতের বিশেষ সম্প্রদায়ের মাথাব্যথা হওয়া একটি মানবিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু সেটি যেন জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে না ওঠে। আবেগের চেয়ে প্রয়োজন সংযম; মেরুকরণের চেয়ে প্রয়োজন সংহতি। সার্বভৌম দেশ হিসেবে ভারতের প্রথম অগ্রাধিকার তার দেশের নাগরিক, তার নিরাপত্তা এবং তার সংবিধান। বিদেশের আগুনে ঘি না ঢেলে, নিজের ঘরটিই আগে সুরক্ষিত রাখা— এই বাস্তববোধই আজ সময়ের দাবি। □

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ

হরমুজ প্রণালীই নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে

শ্যামলকান্তি মজুমদার

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যৌথভাবে আকাশ পথে আমেরিকা ও ইজরায়েল ইরানের ওপর বোমাবর্ষণ করে এবং প্রথম দিনেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খোমেইনি নিহত হয়। বিমান বাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষের সামরিক পরিকাঠামো ধ্বংস করা এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন তথা শরিয়া আইন বলবৎকারী কট্টর মুসলমানদের হাত থেকে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এটি এমন এক বিমান হানা আক্রমণ যার লক্ষ্য দ্রুত ইরানের পতন ঘটানোর সঙ্গে ইরানের পরমাণু বোমা তৈরির কর্মসূচি তথা উচ্চ-স্তরীয় ইউরোপীয় সমৃদ্ধ পরিকাঠামো সমূলে ধ্বংস করা। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করে রেখেছিল ইজরায়েলকে এবং এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ইজরায়েল তার জন্মলগ্ন থেকেই মুসলমাদের সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ হলো ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকট, ১৯৬৭ সালের ছ'দিনের যুদ্ধ, ১৯৭৩ সালের ইয়োম কিপুর যুদ্ধ, ১৯৮২ ও ২০০৬ সালের লেবানন যুদ্ধ। এছাড়াও রয়েছে চলমান সংঘাত সমূহ। এই যুদ্ধগুলোর অন্যতম কারণ হচ্ছে ভূমি ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিরোধ, ধর্মীয় ও আদর্শগত বিরোধ যা তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনের সময়ে লেখা কোরান এবং সহি বুখারির হাদিসের আয়াত সমূহ থেকে সৃষ্ট।

আমেরিকা ও ইজরায়েল এই যুদ্ধে ইরানের শক্তি ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তাদের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে রয়েছে দেশটির সামরিক, পারমাণবিক, মিসাইল এবং ড্রোন উৎপাদন কেন্দ্র, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কমান্ড সেন্টার, নৌবাহিনী, আইআরজিসি-এর নেট ওয়ার্ক-সহ ইরানের বর্তমান শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ধ্বংস করা। গত প্রায় এক মাসের যুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েল তাদের লক্ষ্য ভেদ করতে পারলেও সম্ভাব্য শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের আসল উদ্দেশ্য এখনো সফল হয়নি।

অন্যদিকে, ইরান এক ভিন্ন লড়াইয়ে লিপ্ত। তেহরান সামরিক ভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করতে পারবে না এবং তার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করে না। সমগ্র বিশ্বে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য যথেষ্ট সময় পর্যন্ত হরমুজ প্রণালীকে অরক্ষিত রাখাই তাদের মূল

উদ্দেশ্য। ইরান মাইন অবরোধ করে প্রণালীটি বন্ধ করেনি, কিন্তু এর পরিবর্তে সূক্ষ্ম রণনীতি অবলম্বন করছে যা হচ্ছে হরমুজ প্রণালীকে বিপজ্জনক করে তোলা। সস্তা ড্রোন, বিক্ষিপ্ত মিসাইল হামলা, এমনকী নৌ-মাইনের গুজব ছড়িয়ে নাবিকদের, বিমাসংস্থা ও জাহাজ কোম্পানিগুলোকে বিপদ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করা। ইরানের উদ্দেশ্য হরমুজ প্রণালীটি বন্ধ করা নয়, শুধু পথটি নিরাপদ নয় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এই কৌশলকে রূপ দিতে ফুজাইবার কাছে একটি ট্যাংকারের ওপর ড্রোন হামলা, জাহাজ চলাচলের পথে ভাসমান একটি নৌ-মাইন আবিষ্কৃত হওয়া তথা হরমুজ প্রণালীতে মাইন বিছানো আছে, এরকম খবর বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তাছাড়া সৌদি আরবের, বাহরাইন, কাতার, ইউএই-সহ, ইউএসএ অপারেটেড ইরাকের ওয়েল ফ্লিড এবং গ্যাস প্ল্যান্টগুলোকে ইরান টার্গেট করছে, যাতে সমগ্র বিশ্বে ক্রুড অয়েল এবং জ্বালানি গ্যাসের সাপ্লাই লাইনকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য। এই কৌশল একটি ভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে— যা ইরানের আকাশ সীমার চেয়ে বৈশ্বিকভাবে অর্থনৈতিক প্রভাবই বেশি। সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু সামরিক লক্ষ্যবস্তু থেকে সরে গিয়ে জ্বালানি বাজারের দিকে ঝুঁকছে, যার অনেকটাই নির্ভর করছে পারস্য উপসাগরকে বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে সংযোগকারী সংকীর্ণ সামুদ্রিক করিডোরটির নিয়ন্ত্রণের ওপর।

বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ দৈনিক দু' কোটি ব্যারেল হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে চলাচল করে। এই হরমুজ প্রণালী যা পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ জলপথ যা প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র ৬ কিলোমিটার প্রকৃত জাহাজ চলাচলের জন্য উপযুক্ত। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় নাব্যতার অভাব। এই জলপথ ইরানকে আরব উপদ্বীপ থেকে পৃথক করে রেখেছে। তাছাড়া ইরানের ভাষাও আরবি থেকে ভিন্ন এবং বর্তমানে ইরানের দুই পার্সেন্ট লোক আরবি ভাষায় কথা বলে।

উপসাগরীয় দেশগুলোর খাদ্যশস্য, সবুজ শাকসবজি, ফল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সব কিছুই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় এই পথ দিয়েই। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের সিংহভাগই এই সামুদ্রিক পথে আমদানি করা হয়। তাই জলপথটি সমগ্র উপসাগরীয় দেশগুলো-সহ এশিয়া ও ইউরোপের জন্য একটি অর্থনৈতিক জীবনরেখা।

সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে অপরিশোধিত তেল বহনকারী জাহাজগুলি ইউরোপ ও এশিয়ার জন্য হরমুজ প্রণালীকে অতিক্রম করতে হয়। তেল তো গল্পের একটি অংশ মাত্র। বিশ্বের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই করিডোর দিয়ে যাতায়াত করে। তাছাড়া উপসাগরীয় দেশগুলোর খাদ্যশস্য, সবুজ শাকসবজি, ফল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সব কিছুই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় এই পথ দিয়েই। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের সিংহভাগই এই সামুদ্রিক পথে আমদানি করা হয়। তাই জলপথটি সমগ্র উপসাগরীয় দেশগুলো-সহ এশিয়া ও ইউরোপের জন্য একটি অর্থনৈতিক জীবনরেখা।

ইরানের এই কৌশল গত অবস্থানই ইতিমধ্যেই আমেরিকাকে বাধ্য করছে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া-সহ ন্যাটোভুক্ত দেশ সমূহকে এই যুদ্ধে যোগদান করতে তথা হরমুজ প্রণালীকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করতে। প্রতিটি ঘটনার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে বিমা চুক্তি-সহ ক্রুড অয়েলের বাজারে। ক্রুড অয়েল ইতিমধ্যেই ৬০ ডলার থেকে বেড়ে ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং জানা গেছে পৃথিবীর ৮৫টি দেশে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের দাম ইতিমধ্যেই ১০ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে যদিও ভারতে এখনো এর এফেক্ট দেখা যায়নি। ইরানের এই কৌশল যদি চলতে থাকে সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা আসতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে জ্বালানি গ্যাস এবং তৈল সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই অবরোধের ফলে একটি ভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র সারা বিশ্বে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই অচলাবস্থা অব্যাহত থাকলে, ইরান এমন এক ধরনের সুবিধা পাবে যা ওয়াশিংটন কয়েক দশক ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করে আসছে তথা পারস্য উপসাগরে তেলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবং ফলস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। এই কথা অনস্বীকার্য যে, জ্বালানি তেল সংকট অব্যাহত থাকলে সারা বিশ্বে তথা তৈল আমদানিকৃত দেশ সমূহে রাজনৈতিক উথাল পাতাল দেখা দেবে। সরকার সমূহ মুদ্রাস্ফীতি, প্রবৃদ্ধির মন্থরতা এবং অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের সম্মুখীন হবে। জোট শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনের চাপ সরকারগুলোর উপর সৃষ্টি হবে।

তাই আগামী দিনে হরমুজ প্রণালী যুদ্ধের নির্ণায়কের ভূমিকা নেবে এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার প্রতি উপসাগরীয় দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। অবশ্য সবটাই নির্ভর করছে কার কৌশল সফল হয় তার উপর। যদিও ইরানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী-সহ বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এবং উপসাগরীয় দেশসমূহ বর্তমান ইরান সরকারের অতিদ্রুত অবসান চাইছে। এই যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে, ততই পৃথিবীর মঙ্গল, অন্যথায় পেট্রোলিয়াম নির্ভর আধুনিক সভ্যতা এবং তার সঙ্গে জড়িত শত সহস্র শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে। □

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য নীতি : ভারতের শক্তিশালী কূটনৈতিক অবস্থানের পরিচয় বহন করছে

সুশান্ত মজুমদার

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের মিলিত সামরিক আক্রমণে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খোমেইনি-র হত্যা এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হওয়া ইরান বনাম আমেরিকা-ইজরায়েল যুদ্ধ আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন সমীকরণের সূচনা করেছে। ইউরোপের দেশগুলিও আশ্চর্যজনকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ মুসলমান দেশ আমেরিকা ও ইজরায়েলকে সমর্থন করছে। আবার রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও চীন ইরানের ওপর এই আক্রমণের নিন্দা করেছে। বিশ্বব্যাপী মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে। এই যুদ্ধ নিয়ে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বে ভারতের 'নিরপেক্ষ অবস্থান' নিয়ে ভারতের মধ্যে বিভিন্ন সেকুলার রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। তবে এদের উদ্দেশ্য যে ইরান যুদ্ধের এই গরম আবহে নিজেদের রাজনীতির গরম তাওয়ায় মুসলমান তোষণের রুটি সেঁকে নেওয়া— সেটা এখন সদ্য ভোটার হওয়া ১৮ বছরের তরুণ-তরুণীরাও বোঝে। তার জন্যে আর নতুন করে এই বিষয়ে চর্চা কেউ আর করে না। সম্প্রতি একটি বিতর্ক তৈরি হয়েছে বেশ কিছু বড়ো পরিসরে। সেই বিতর্ক ভারতের সংসদ পর্যন্তও গড়িয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইরানের সমর্থনে এবং আমেরিকা-ইজরায়েলের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে রাস্তা অবরোধ, মিছিল ও বিক্ষোভ। জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক ও কেরালায় এই বিক্ষোভের মাত্রা বেশি। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ও সিপিএম-সহ অনেকগুলি বামপন্থী দল ইরানের সমর্থনে ইসলামি উম্মা-র নামে তাদের আওয়াজ তুলেছে। রাস্তায় নেমে সরাসরি তারা ইজরায়েল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক চাপ তৈরি করে ইরান বনাম আমেরিকা-ইজরায়েল সংঘাতের প্রেক্ষিতে ভারত সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য বিবৃতি ও পালটা বিবৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে লক্ষ্য করছে ভারতবাসী। কিন্তু ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক তাৎপর্যপূর্ণভাবে, খুব ঠান্ডা মাথায় একটি 'নিরপেক্ষ' অবস্থান বজায় রেখেছে। এদিকে হাজার হাজার ভারতীয় যাঁরা ইরানে আটকেছিলেন, তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ইরান সরকারের সঙ্গে কথা বলে। আবার ইজরায়েল ও আমেরিকাকে শান্তি রক্ষার বার্তা পাঠিয়ে বিশ্বশান্তির পক্ষে তার শক্ত অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত। একইভাবে আরব সাগর উপকূলে অবস্থিত ভারতীয় বন্দরে ইরানি জাহাজকে আশ্রয় দিয়ে ভারত নিজস্ব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মার্কিন রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছে। আবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ইরানের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিয়ে, কূটনৈতিক কৌশলে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের তেলবাহী জাহাজগুলির হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ইরানের 'সবুজ সংকেত' আদায় করে নিয়েছে ভারত। সুতরাং, এই যুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষ কূটনৈতিক অবস্থানের দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনীতিতে এই মুহূর্তে ভারতের লাভের পাল্লা অনেকটাই ভারী। গোটা ব্যাপারটা যেহেতু আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের ব্যালেন্সড্ কূটনৈতিক অবস্থান এবং বর্তমান ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের দূরদর্শী নীতি বিষয়ক, সেহেতু সেটা অবশ্যই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আগামীদিনে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত প্রশমনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে পারে ভারত।

বিশ্বে ৫৭টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ রয়েছে। কখনও কি কেউ ভেবে দেখেছে যে, কেন অধিকাংশ মুসলমান দেশ ইরানকে সমর্থন করে না? ইরান আজ কোন কোন দেশে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে? সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন, কাতার, ওমান, কুয়েত— সবগুলোই মুসলমান দেশ। ইরান চাইলে কেবল এই দেশগুলিতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে পারত। তারা সৌদি আরবের আরামকো তৈল শোধনাগার, দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং অন্যান্য অসামরিক ভবনগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছে। হিজবুল্লা, হামাস ও হুথি জঙ্গিদের মদতদাতা হলো ইরান। ভারতের কিছু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, ইরানকে সমর্থনের মাধ্যমে তারা ইসলামকে সমর্থন করছে। ভারতে তারা ইরানের সমর্থনে মিছিল-সমাবেশ করছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে আমেরিকা-ইজরায়েলের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে রাস্তা অবরোধ, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তাহলে সেই যুক্তিতেই বলতে হয় যে, সৌদি আরব, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, ওমান, পাকিস্তান--- এইসব দেশগুলো যারা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা-ইজরায়েলকে সাহায্য করছে, তারা কি ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে? তাহলে কি এইসব ইসলামি দেশগুলো ইসলামি উম্মার বিরুদ্ধে? যারা ভারতে বিক্ষোভ করছে ইসলামি সেন্টিমেন্ট কাজে লাগিয়ে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে সেই কথা।

২০২৫ সালে ইরানের জনগণ রাস্তায় নেমেছিল সেদেশের দীর্ঘ পাঁচ দশকের স্বৈরাচারী মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। হাজার হাজার মানুষকে ইরানের সরকার হত্যা করেছে রাস্তায় গুলি করে, গ্রেনেড ছুঁড়ে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে। বিগত কয়েক দশকে খোমেইনি-র ইরানের ইসলামি স্বৈরাচারী মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইরানের মানুষ যতবার আন্দোলন করতে রাস্তায় নেমেছে, ততবার গণতন্ত্রপ্রেমী ইরানের মানুষের ওপর নেমে এসেছে ইরান সরকারের নৃশংস অত্যাচার, গুলি করে গণহত্যা, জেলবন্দি করে পুলিশি অত্যাচার, বিনা বিচারে ফাঁসি। ইরান দেশটির একটি আলাদা ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। বর্তমানে যে ইসলামি ইরানকে বিশ্ব দেখছে, সেই ইরান হলো গত পাঁচ দশক ধরে ক্ষমতা দখলকারী মোল্লাতন্ত্রের হাতে তৈরি ইসলামি ইরান। ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত ইরান আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে এগিয়ে থাকা, আধুনিক ও প্রগতিশীল শাসকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি উন্নত দেশ ছিল। আর এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজকের ইরান একদা ছিল উন্নত পারস্য।

ইরান-ইজরায়েল সংঘাত প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'নীরবতা' অনেকের মনে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। এটাই নতুন ভারত। অনেকেরই মনে জিজ্ঞাসা যে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নিহত হওয়ার পরে মোদীজী কেন এক্স-হ্যান্ডলে ট্যুইট বা ফেসবুকে পোস্ট করে কোনো শোকবার্তা জানাননি? বাস্তব হলো, আবেগগত সম্পর্ক বজায় রাখার যুগ

শেষ; এখন ভারতের বিদেশনীতিতে শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থ এবং ভারতের নিজস্ব ভবিষ্যতের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। ভারত কেবলমাত্র গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে এবং লক্ষ্য রাখছে খোমেইনি-হত্যা পরবর্তী পর্যায়ে ইরানে ক্ষমতার আসনে কে আসীন হয়। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বর্তমানে পুরোপুরি ভারতের নিজস্ব স্বার্থনির্ভর। কিছু ক্ষেত্রে ইস্যুভিত্তিক। একটি পরিণত বিদেশনীতির দেশ হিসেবে ভারত ইরানের সঙ্গে 'রোমান্স' চায় না; ভারত চায় ইরানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য। এখন ভারতের চোখ ইরানের সঙ্গে বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির দিকে, যা চীনা কোম্পানিগুলির কারণে বহুদিন ধরে বিঘ্নিত হচ্ছিল। ইরান-সহ মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ভারত তার নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। ড্রাগনকে পিছনে ঠেলে দেওয়াই এখন ভারতের লক্ষ্য। ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে বালোচিস্তানের প্রতিটি কোণে প্রভাব বিস্তার করাও ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রারম্ভিক পর্যায়ে ইরানের বিষয়ে নীরবতা বজায় রাখলেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শাসকের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীজী কথাবার্তা বলেছেন। তিনি ট্যুইটও করেছেন এবং সাধারণ মানুষের প্রাণহানির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তথাকথিত উদারপন্থী লবি বলছে এটা নাকি দ্বিমুখী নীতি। প্রত্যুত্তরটা সোজা ও তিক্ত। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে চাকরি ও ব্যবসাসূত্রে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বসবাস করেন। ভারতীয়দের কষ্টার্জিত অর্থ ও সংস্কৃতি সেখানে প্রোথিত। এমনও খবর রয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের হানায় একজন নেপালি হিন্দুও তাঁর জীবন হারিয়েছেন। যখন ভারতের নিজস্ব নাগরিক, অর্থাৎ ভারতীয় জনগণের কথা আসে, বিশ্বের কোনো প্রান্তে তাঁরা যখন আক্রান্ত হন, তখন সব ভারতীয়দের সঙ্গে মোদীজীও যন্ত্রণা অনুভব করেন। উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তার জন্য ভারতের সহানুভূতি ও শক্তি উভয়ই রয়েছে। সরল সত্য এই যে, 'উম্মা'র তথাকথিত ভ্রাতৃত্বের মধ্যে আটকে পড়ে না ভারত। সেই যুগ ২০১৪-পরবর্তী সময়ে পিছনে ফেলে এসেছে গোটা দেশ। নিজস্ব স্বার্থ, নিজস্ব সীমান্ত ও ত্রিবর্ণ পতাকার অবস্থান দেখে বর্তমান ভারত। নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে, মুসলিম ব্রাদারহুড বা উম্মার স্বার্থে, তেল-গ্যাস-সহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদের দখলদারির স্বার্থে যদি পৃথিবীর কোনো দেশ জ্বলতে চায়, তাহলে তারা জ্বলুক, কিন্তু এসবের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কেবলমাত্র নিজস্ব ঘর আলোকিত রাখতে চায় ভারত। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলবে ভারত। তাই ভারত এখন শুধুমাত্র ভারতের নিজের পক্ষে। আর 'নিরপেক্ষ' নয় বর্তমান ভারত। জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত হওয়াই এখন ভারতের কূটনৈতিক অগ্রাধিকার।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে দেয় ইরান নৌবাহিনী। সমগ্র বিশ্বের খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালীর মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সংকটের আশঙ্কা থাকলেও বর্তমান ভারত সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতির সুফল পায় গোটা দেশ। ইরান ইস্যুতে ৪ মার্চ পর্যন্ত নীরবতা বজায় রাখে ভারত। গত ৫ ও ১২ মার্চ ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি-র সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর টেলিফোনে কথাবার্তা বলার পরেই তেলবাহী ভারতীয় জাহাজগুলি হরমুজ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে বলে জানায় ইরান। গত ৫ মার্চ নয়াদিল্লি-স্থিত ইরানের দূতাবাসে গিয়ে আয়াতোল্লা খোমেইনি-র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব বিক্রম মিস্রি। এরপরই গত ১৬ মার্চ প্রায় ৪০ হাজার টন লিক্যুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) নিয়ে গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে পৌঁছায় গ্যাসবাহী ট্যাঙ্কার 'শিবালিক'। গত ১৭ মার্চ প্রায় ৪৬ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি নিয়ে গুজরাটের ভাদিনার বন্দরে পৌঁছায় গ্যাসবাহী ট্যাঙ্কার 'নন্দা দেবী'। গত ২১ মার্চ ২২টি দেশ যৌথ বিবৃতি জারি করে উপসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে ইরানের হামলার নিন্দা জানায়। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে— সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইউকে, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস্, জাপান। কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক, লাতভিয়া, স্লোভেনিয়া, এস্তোনিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, রোমানিয়া, বাহরিন, লিথুয়ানিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন কাউন্সিলও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-সহ ১১৫টি সদস্য দেশের পক্ষ থেকে এই ইস্যুতে আনা নিন্দা প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে যে, গোপনে উপগ্রহ চিত্র ও গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে ইরানকে মদত দিচ্ছে রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়া। অসমর্থিত সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাশিয়া আমেরিকাকে প্রস্তাব দিয়েছে যে, ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে মার্কিন বাহিনী সরে এলে, ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ বন্ধ করবে রাশিয়া। গত ১৮ মার্চ চিকিৎসা সহায়তার লক্ষ্যে ইরানে মেডিক্যাল টিম প্রেরণ করেছে ভারত, যা যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের এক মানবিক প্রয়াসের উদাহরণ। ইরানের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণ করেছে তেহরান-স্থিত 'দ্য ইরানিয়ান রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটি'। এই সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ইরান। গত ২১ মার্চ টেলিফোনে ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বার্তালাপ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পেজেশকিয়ানকে ইদ ও নওরোজের শুভেচ্ছা জানান মোদীজী। গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক পরিকাঠামোর ওপর আঘাত অব্যাহত থাকলে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হবে এবং আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইন প্রভাবিত হবে বলে জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অনবরত আক্রমণের নিন্দাও করেন মোদীজী। এই উৎসবের মরসুম পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। অবিলম্বে সামরিক উত্তেজনা প্রশমন বা ডি-এস্ক্যালেশনের লক্ষ্যে সবপক্ষের অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া উচিত বলেও তিনি মতপ্রকাশ করেন।

গত ২১ মার্চ ইরানের নাতাঞ্জ-স্থিত পরমাণু প্রকল্পে (শাহিদ আহমদি রোশন এনরিচমেন্ট ফেসিলিটি-তে) হামলা চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল। আঘাতের পর কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়েনি বলে জানিয়েছে তসনিম নিউজ এজেন্সি। এর আগে ভারত মহাসাগর-স্থিত দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইরান ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়েছে বলে জানায় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। যদিও ক্ষেপণাস্ত্রটিকে মাঝপথেই ইন্টারসেপ্ট করে মার্কিন সেনা। এরই পালটা প্রতিক্রিয়ায় নাতাঞ্জে আক্রমণ চালায় আমেরিকা। নাতাঞ্জে হামলার পর ইজরায়েলের ডিমোনা-তে অবস্থিত পরমাণু প্রকল্পে ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে বলে জানা যায়। ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৮০ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইজরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। গত ২১ মার্চ হরমুজ প্রণালী অবরোধমুক্ত করার জন্য ইজরায়েলকে ৪৮ ঘণ্টার ডেডলাইন বেঁধে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প। নয়তো ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি আমেরিকা ধ্বংস করবে বলে জানান তিনি। এরপর সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চলকে তারা অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবে বলে পালটা হুমকি দেয় ইরান। এছাড়াও ইরানের উপকূল বা কোনো দ্বীপপুঞ্জে হামলা চালানো হলে পুরো পারস্য উপসাগর অবরোধ করতে মাইন পাতার হুমকি দিয়েছে ইরানের ডিফেন্স কাউন্সিল। আমেরিকা হামলা চালালে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর ইরানও পালটা হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা। এছাড়াও গত ২৩ মার্চ ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি জানিয়েছে, পারস্য উপসাগর জুড়ে ইরান সামুদ্রিক মাইন বিছিয়ে দিলে আগামীদিনে এই অঞ্চলে জাহাজ চলাচল প্রবলভাবে বিঘ্নিত হতে পারে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। □

নির্বাচন ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অস্তিত্ব সঙ্কট থেকে মুক্তির নির্বাচন

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী নিজের মুখে সনাতন ধর্মকে যে ভাষায় কথা বলে হেয় করে চলেছেন সেটির জবাব দেওয়ার সুযোগ এসেছে। এই ক্রান্তিকালে হিন্দুদের গতানুগতিক সেকুলার হয়ে থাকা হবে স্মৃতিভ্রংশের মতো আত্মহনন। তিনি এবং তাঁর দলের নেতারা আগ বাড়িয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকার জন্য এর বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান করেছেন। তিনি একটি মজহবি আবেগকে উসকে দিয়েছেন। তিনি এক সংঘাতের দিকে নিয়ে চলেছেন পুরো পশ্চিমবঙ্গকে। সহনশীলতার মাত্রাতিরিক্ত নীরবতা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছলেও কার্যত তার প্রতিবাদ কেউ করেনি। হিন্দু সংস্কৃতিধন্য মাটিতে এহেন বিভাজনের বিষবৃক্ষে এখনই কুঠারাঘাত করা না গেলে হিন্দুরা এবার বাংলাদেশের মতো অস্তিত্ব সংকটের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এক গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও আচরণের ধারাবাহিকতা। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর একাধিক মন্তব্য ও অবস্থান শুধু রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়নি, বরং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রকাশ্যে এমন মন্তব্যও করেছেন যে মহাভারত নাকি রচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ক্ষমতার জোড়ে ইতিহাস পালটে এই ধরনের বক্তব্য শুধু ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অজ্ঞতার পরিচয়ই দেয় না, বরং ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে তুচ্ছ করার একটি প্রবণতার দিকেও ইঙ্গিত করে। মহাভারত, যা হাজার বছরের প্রাচীন এক মহাকাব্য এবং যার রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস, সেটিকে এভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা নিছক ভুল নয়; এটি এক ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাংস্কৃতিক অবমাননা হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে।

এর পাশাপাশি, হোলির মতো একটি গভীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবে 'হোলি মোবারক' বলার ঘটনাও নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এটি শুধুমাত্র একটি শব্দচয়নগত ভুল নয়; বরং একটি সচেতন রাজনৈতিক বার্তা। কারণ 'মোবারক' শব্দটি মূলত ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। হিন্দুদের অন্যতম উৎসবে এই শব্দ প্রয়োগকে অনেকেই তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যকে ম্লান করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলোকে একত্রে বিচার করলে একটি বৃহত্তর প্রশ্ন সামনে আসে। এগুলি কি শুধুই বিচ্ছিন্ন ভুল, নাকি এর পেছনে রয়েছে একটি সুপরিকল্পিত সুদূরপ্রসারি রাজনৈতিক কৌশল? সমালোচকদের একাংশের মতে, এই ধরনের বক্তব্য ও আচরণ আসলে সমাজের মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজন তৈরি করে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক লাভের জন্য ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে ব্যবহার করা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নতুন কিছু নয়। তিনি সরাসরি সামাজিক সম্প্রীতিকে আঘাত করেছেন, যা এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠেছে।

একটি গণতান্ত্রিক রাজ্যে রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব শুধু প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা নয়; বরং রাজ্যের সকলের

মধ্যে বিশ্বাস, সম্মান ও সহাবস্থানের পরিবেশ বজায় রাখা। কিন্তু যখন সেই নেতৃত্ব থেকেই এমন বক্তব্য আসে যা বিভ্রান্তি, ক্ষোভ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, তখন তা শুধু রাজনৈতিক ব্যর্থতাই নয়; একটি বৃহত্তর সামাজিক সংকটেরও ইঙ্গিত দেয়। আজকের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এই ধরনের বক্তব্য ও আচরণের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজ কতটা সচেতন ও প্রতিবাদমুখর? কারণ নীরবতা অনেক সময় সম্মতির ইঙ্গিত দেয়, আর সেই নীরবতার সুযোগেই বিভাজনের রাজনীতি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আজ আর নিছক ক্ষমতার লড়াই নয়;এটি এখন বয়ানের যুদ্ধ, মানসিকতার যুদ্ধ এবং ক্রমশ এক বিপজ্জনক অস্তিত্ব-সংকটের দিকে ধাবিত সমাজের প্রতিচ্ছবি। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এই লড়াই কেবল উন্নয়ন বনাম উন্নয়নের নয়; এটি বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস, নিরাপত্তা বনাম আশঙ্কা এবং সহাবস্থান বনাম মেরুকরণের এক কঠিন সংঘর্ষ। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, রাজনৈতিক ভাষার অবক্ষয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এমন এক সুর বারবার ফিরে আসে, যা সনাতন ধর্ম ও তার অনুসারীদের প্রতি অসম্মানজনক। রাজনীতির মঞ্চ যখন শ্রদ্ধার ভাষা হারায়, তখন তা কেবল প্রতিপক্ষকে আঘাত করে না;সমাজের ভেতরেও এক গভীর বিভাজনের বীজ বপন করে। আর এখানেই থেমে নেই পরিস্থিতি। রাজ্যের শাসকদলের কিছু নেতার বক্তব্য ও আচরণ এমন এক বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের রূপ নিচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, এ কি কেবল ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল, নাকি এটি একটি বৃহত্তর মানসিকতার প্রতিফলন,যেখানে বিভাজনই হয়ে উঠেছে টিকে থাকার অস্ত্র?

এই প্রেক্ষাপটে হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে যে ক্ষোভ, যে অস্বস্তি, তা হঠাৎ তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিনের নীরবতা, সহনশীলতার নামে আত্মসমর্পণ এবং তথাকথিত 'সেকুলার' অবস্থানের আড়ালে নিজের পরিচয়কে ক্রমশ গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, এসব মিলে একটি মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে। হিন্দু সমাজ মনে করছে, এই নীরবতা আর নিরপেক্ষতা নয়; এটি আত্মবিস্মৃতি, এমনকী আত্মবিনাশের দিকে এগোনোর নামান্তর। তাই এখনই সবচেয়ে বড়ো সাবধানতার প্রয়োজন।

কারণ, যখন অস্তিত্ব রক্ষা একটি রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয়, তখন তা খুব দ্রুতই যুক্তির সীমা অতিক্রম করে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আর আবেগের রাজনীতি কখনো স্থিতিশীলতা আনে না; এটি সংঘাত ডেকে আনে, সমাজকে খণ্ডিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদে এমন ক্ষত তৈরি করে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করতে হয়। প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কি নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন?

আসন্ন নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এই পরিস্থিতিকে যৌক্তিকভাবে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তারা খুব সচেতনভাবেই অবিচার, অবহেলা ও নিরাপত্তাহীনতার মতো বিষয়গুলিকে সামনে এনে হিন্দুদের সচেতন ও সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। ফলে একদিকে অভিযোগ, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া— এই চক্রে রাজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আসল সত্য হলো, পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল শুধু একান্ত অবশ্যক নয়, অবধারিতও হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের প্রকাশ্যে হত্যা, স্কুলে সরস্বতীপূজায় বাধা, মন্দির ভাঙা, মূর্তি ভাঙা— এরকম বহু ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে সারা রাজ্যে নৈরাজ্যের পরিবেশ এবং বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে তার অবসান শুধু বর্তমান সরকারের পতনের মধ্য দিয়েই হতে পারে।

এবারের নির্বাচনে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংকল্প হয়ে উঠুক এই নির্বাচন। হিন্দুদের জাগরণের বোধন হোক এবারের ভোটদান। হিন্দুরা শত প্রতিশত ভোট প্রদান করুন। এরাজ্যে গণতন্ত্র নেই। ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন এতই বেড়েছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকেও এরা অসম্মান করতে ছাড়ে না। সবচেয়ে বড়ো বিপদ হলো, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, এসব বিষয় শাসক দলের মুখে-মুখে থাকলেও বাস্তবে বহু আগেই বিসর্জিত হয়েছে। সত্য লুকানোর সুযোগ শাসক দলের হাতে আর নেই। তার উপর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন এখন হিন্দুদের সামনে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

এই নির্বাচন নির্ধারিত হবে কারা ক্ষমতায় আসবে, যারা মানুষকে মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ এনে দেবে, না যারা এই রাজ্যটিকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করবে? আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি এই দুয়ের তফাত করতে না পারেন, তাহলে শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব এই রাজ্যটিকে জঙ্গলের রাজত্ব নামেই অভিহিত করবে। □

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই নির্বাচনে নির্ধারিত হবে কারা ক্ষমতায় আসবে? যারা মানুষকে মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ এনে দেবে, না যারা এই রাজ্যটিকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করবে?

পশ্চিমবঙ্গের মুখ শুভেন্দু অধিকারী

সুবল সরদার

নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর লড়াই দেখছে বাঙ্গালি। বুকের পাটা আছে বলতে হবে! দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত এক প্রাণ। মৃতপ্রায় বাঙ্গালিকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এখন ২০২৬-এর নির্বাচনী প্রস্তুতি চলছে। টান টান উত্তেজনা। কখন কী হয়, কে-কোথায় প্রার্থী হচ্ছেন, কে জিতবেন, কে হারবেন, তা মানুষের মধ্যে আলোচনা চলছে। চায়ের দোকান থেকে ট্রেনে, বাসে, হাটে বাজারে। তৃণমূলের ব্যাপক দুর্নীতি জনগণের মনকে নাড়া দিয়েছে। বেকারদের স্বপ্ন চুরি, শিক্ষিত যুবকদের চাকরি চুরি; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প এখন সব লাটে উঠে গেছে। শাসকদল একের পর এক দুর্নীতি করে চলেছে। সন্ত্রাসে ভরা পশ্চিমবঙ্গ এখন মৃত্যু উপত্যকা। সত্যিকারের জনাদেশ ছাড়া ভোট লুট করে কীভাবে তিনি ক্ষমতার শিখরে বসে আছেন, তা দেখছে রাজ্যবাসী। তৃণমূল সরকারের প্রায় সব মন্ত্রী জেলের ভাত খেয়েছেন। বিধায়ক, সাংসদ কেউ বাদ যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি নামক একটা নতুন শিল্প আমদানি করেন, সাম্প্রদায়িক, ইসলামীকরণ যা চিরকাল সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা করে আসে। গত ৯ মার্চ তিনি ধরনামঞ্চ থেকে বলেছেন— তারা আছে বলে আমরা ভালো আছি, অন্যথায় এক শ্রেণী (উগ্র মুসলমান) ঘিরে ধরে আমাদেরকে মেরে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবে। মুর্শিদাবাদ থেকে হুমায়ুন কবীরও ওই একই কথা বলেছেন, তারা হিন্দুদের মেরে কেটে ফেলবে, কারণ তারা সেখানে সংখ্যাগুরু। মুসলমান নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিয়েছেন সনাতনী হিন্দুদের মেরে ফেলার জন্যে।

শুভেন্দু অধিকারী যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যোগ্য উত্তরসূরী হন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সুরাবর্দির যোগ্য প্রতিনিধি। এই সুরাবর্দি ছিলেন '৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের কসাই। দেশভাগের কারিগর গান্ধীর উপদেশ উপেক্ষা করে সেদিন অস্ত্র হাতে রণহুংকারে জবাব দিয়েছিলেন গোপাল মুখার্জি একাই। আজ দেখা যাচ্ছে সুরাবর্দির ভূমিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কখনো তিনি নমাজ পড়ছেন, বোরখা পড়ছেন, দোয়া করছেন, ইফতার পার্টিতে যাচ্ছেন। 'দোল মোবারক' বলছেন। এটা তিনি মুখ ফসকে বলেননি। তিনি ইচ্ছা করে একটি শ্রেণীকে কাছে টানার জন্যে এমন নাটক করছেন। এই নাটক পৌনঃপুনিকভাবে পা ভাঙ্গা, পড়ে গিয়ে কপালে রক্তের দাগ ইত্যাদি তিনি করেই চলেছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা মুখোশের আড়ালে না থেকে সরাসরি হিন্দুদের একজোট হতে বলেছেন। হিন্দুদের তিনি একজোট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন অন্যথায় আবার শরণার্থী হতে হবে। আমার বাঙ্গালিরা আর কতবার শরণার্থী হব? কতবার দেশভাগের বলি হব? কত রক্ত ঝরবে? কত প্রাণ যাবে?

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন সার্থক ভাবে রূপায়ণ করার জন্য আজকের দিনে শুভেন্দু অধিকারী গোপাল মুখার্জির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি নির্ভীক ভাবে বুক চিতিয়ে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেন গত নির্বাচনে। তিনি এই তথাকথিত অগ্নিকন্যাকে হারিয়ে, তার মিথ্যা বিপ্লবের ফানুস চুপসে দিয়েছেন। তৃণমূলনেত্রীকে 'পুনর্মূষিকোভব' করে ছেড়েছেন। এবারের নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এবারেও তিনি জিতবেন। জনগণ সেই কথা বলছে। বিরোধিতা কাকে বলে, বিরোধী দলনেতা কাকে বলে সারা বঙ্গ তথা ভারতের জনগণ দেখছে। লড়াকু নেতার লড়াই বটে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোধহয় এটাই প্রথম। এই বঙ্গে থেকে সেই আগামী দিনের ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

সিপিএম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস— সবাই সংখ্যালঘু তোষণ করতে করতে সংখ্যালঘু আজ আমাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিবর্তন করতে চলেছে। তাই আজ সনাতনী হিন্দুদের অস্তিত্ব মহাসংকটে। আজ আমরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ইদে মুসলমান সরকারি কর্মচারীরা সবেতন হাফ ছুটি পান প্রায় একমাসের জন্যে। ইদ ছাড়া অন্য সময় তারা মসজিদ যাচ্ছে নমাজ পড়তে সরকারি কাজ ফেলে রেখে।

কিন্তু হিন্দু সরকারি কর্মচারীরা একাদশী করলে সবেতন ছুটি মেলে? তারা মুসলমানদের মতো সরকারি কাজ ফেলে মঙ্গলবারে হনুমান চল্লিশা পাঠ করলে অফিস-আদালত চলবে? কেন এই দ্বিচারিতা মুঘল শাসন থেকে বর্তমান শাসন ব্যবস্থায়? তিনি ইমাম ভাতা চালু করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী এখানেই মৌচাকে ঢিল মেরেছেন। তাই সবাই রে-রে করে তেড়ে আসছে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে দেবার জন্য। '২৬-এর নির্বাচনী লড়াইয়ে একমাত্র নাম শুভেন্দু অধিকারী। তিনিই বলতে পারেন হিন্দুরা একজোট হন, দেশ থেকে রোহিঙ্গাদের তাড়াও, হানাদার, বিদেশিদের তাড়াতেই হবে, মুসলমান বাংলাদেশিরা কখনো এদেশের নাগরিক হতে পারে না। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলেছেন। তিনি জনগণের কণ্ঠস্বর। তিনি জনগণের ভাষা বুঝতে পারেন। যতবার তিনি কথা বলেছেন, ততবার তিনি জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। তিনি জনগণের ভাষা বুঝতে পারেন। সাধারণ মানুষ যতবার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে, ততবার তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সঠিক কাণ্ডারি। তাঁর সঠিক নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে বলে জনগণ মনে করে। □

ফঃ ৩

এবারের নির্বাচন এক অপশাসন অবসানের নির্বাচন

তারক সাহা

রাজ্য বিধানসভার ভোট আসন্ন। এবারের ভোট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ভোটে রাজ্যের মানুষ এক অপশাসনের অবসান আশা করছে। এবারের নির্বাচন বিগত নির্বাচন থেকে অনেক কারণেই পৃথক। সেগুলো হলো— (১) 'বদলা নয় বদল চাই'— তৃণমূল ক্ষমতায় এসেই শুরু থেকেই তাদের এই স্লোগানের বিপরীতে হাঁটতে শুরু করেছে। তিনটি নির্বাচনে পরপর জিতে এখন বদলা নিতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় নেত্রী বা দলের বিপক্ষে সমালোচনা হলেই ইউটিউবারদের ধরপাকড় শুরু করেছে, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঞ্চালকরাও।

(২) টানা চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটা বিকল্প মুখ খুঁজছিল এবং মমতা ব্যানার্জির মধ্যে সেই তাদের মুখ খুঁজে পেয়েছিল। তারই ফলে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল। এরপরে শুরু হলো রাজ্যে বিভিন্ন চিটফান্ডের সঙ্গে শাসকদলের বিধায়কদের যোগসাজশে কোটি কোটি মানুষের বিশেষত গরিব মানুষের সঞ্চয় লুটেপুটে খাওয়া। নানা অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন শাসকদলের নামি-দামি নেতা-মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়করা, যেমন— মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, তাপস পাল, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারদা চিটফান্ড থেকে সবচেয়ে লাভবান ব্যক্তি যে তৃণমূলনেত্রী স্বয়ং, তা জানাতে ভোলেননি কুণাল ঘোষ। ২০১৩ সালে পুলিশ ভ্যান থেকে শিয়ালদহ আদালত চত্বরে তাঁর চিৎকার করে সেই ঘোষণা আজও স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে রাজ্যবাসীর। তবুও রাজ্যবাসী তাকে বা তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরায়নি ২০১৬ সালে। এরপর এলো বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের নাম এবং এদের অনেকেই জেলবন্দি হলেন। মানুষের অভিযোগ— চুরি, পাচারের লভ্যাংশ নাকি কালীঘাটের সর্বোচ্চ নেত্রী এবং তাঁর ভাইপোর কাছে পৌঁছে যেত পুলিশ কর্তাদের মাধ্যমে। এ নিয়ে আইন-আদালত, কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা তদন্ত চলছে আদালতের নির্দেশে।

এরপর এলো ২০২২, রাজ্য তথা দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতি চাকরি চুরির ঘটনা। শিক্ষামন্ত্রীর এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা এবং এগারো কেজি সোনা উদ্ধার হলো, গ্রেপ্তার হলেন শিক্ষামন্ত্রী-সহ বিধায়ক ও কয়েকজন আমলা। তারা জেলবন্দি থাকলেন বেশ কিছু সময়। ২০২১-এও কিন্তু রাজ্যবাসী আস্থা রেখেছিল তাদের ওপর। বরং বিগত দুটি নির্বাচন থেকে আরও বেশি আসনে জয়ী করে।

এই ধরনের ব্যাপক ও সর্বস্তরে এই দুর্নীতি— দলের ওপর থেকে নীচু স্তরের সব নেতা-নেত্রীদের নাম এমন ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েনি স্বাধীনতার পর কোনো দল বা জোটের বিরুদ্ধে।

এরপর ২০২৬ সাল। আবার একটা নির্বাচন এবং এই নির্বাচন অন্য নির্বাচন থেকে আলাদা। এই রাজ্যের শাসকদল সদ্যসমাপ্ত ইদের নমাজ পড়ার স্থান রেড রোডে উপস্থিত হয়ে সেই স্থানকে রাজনৈতিক আখড়া বানিয়ে দিলেন নেত্রী। এটা নতুন কিছু নয়। আগেও হিজাব পরে ইদের নমাজে উপস্থিত হয়েছেন, আবার হিজাব পরে পিতৃপক্ষে (হিন্দু মতে যা অসিদ্ধ) দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেছেন। এ নিয়ে সর্বস্তরে ধিকৃত হয়েছেন। এবারের ইদের নমাজে রাজনীতিকে ব্যবহার করায় মুসলমানরাও তার নিন্দা করেছেন এবং সমাজমাধ্যমে অনেকেই তার ধিক্কার জানিয়েছেন। এবারের নির্বাচন বিগত নির্বাচনগুলোর থেকে পৃথক এই জন্য যে এই নির্বাচনে নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করেছেন তাঁর সদ্য সমাপ্ত ধরনামঞ্চ থেকে তাঁর বিবৃতির মাধ্যমে।

এবারের নির্বাচন অন্য নির্বাচন থেকে আলাদা এই জন্য যে আগে কখনো কোনো রাজনৈতিক দল বা জোটের কোনো সংবিধান স্বীকৃত পদাধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর মতো ব্যক্তিত্ব সাংবিধানিক নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে এমনভাবে ন্যক্কারজনকভাবে এসআইআর নিয়ে বিতর্কে জড়াননি। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং তিনি সমালোচনার শিকার হয়েছেন।

শুধু কী তাই? এই সরকার 'জয় বাংলা' স্লোগানকে পশ্চিমবঙ্গের স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্লোগানটি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশের স্লোগান। এটাও ভারতের জাতীয়তা বিরোধী। শুধু তাই নয়, দেশের স্বীকৃত জাতীয় সংগীত থাকা সত্ত্বেও 'বঙ্গ সংগীত' প্রবর্তনের চেষ্টা চালানো হয়েছিল। বাংলাদেশের জামাতিরা ইউনুস সরকারের সময়ে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বাংলাদেশ ও চিকেন নেক নিয়ে 'গ্রেটার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। এরা এর সুযোগ নিয়ে ছিল তার একটিই কারণ যে সীমান্তের এপারে জামায়াতের বন্ধু 'তৃণমূল সরকার' রয়েছে— যা কিনা ভারতেরই অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।

এতগুলো কারণে এবারের নির্বাচন বিগত নির্বাচনগুলোর থেকে একেবারে আলাদা। গণতন্ত্রের মূল বিষয় হলো বিনা রক্তে ভোটের মাধ্যমে সরকার বদল করা। ২০২৬-এ সেই সুযোগ এসেছে বদলের। এর সদ্ব্যবহার যদি রাজ্যবাসী না করতে পারে, তাহলে তাদের দুর্ভাগ্যের সীমা-পরিসীমা থাকবে না— একথা বলাই যায়। □

নারীর ক্ষমতায়নে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার

অজয় ভট্টাচার্য

মোট ৩৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১৭.৩২ কোটি ভোটারকে নিয়ে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১-৫২ সালে। ভোট পড়েছিল প্রায় ৪৫ শতাংশ। তারপর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভোটদাতার সংখ্যা বেড়েছে। এর মাঝে সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে প্রচুর। ফলে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় মহিলা ভোট উৎসবে শামিল হয়েছেন। বলাবাহুল্য, কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদীর উত্থানের সময় থেকে দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক কর্মযজ্ঞে মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অতি বড়ো নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ তথ্যপ্রমাণাদি সে কথাই বলছে।

উল্কার মতো উত্থান হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই ২৮২টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল এবং এনডিএ জোট পেয়েছিল ৩৩৬ টি আসন। সেবার বিরোধী দলের তকমাও জোটাতে পারেনি কংগ্রেস। মাত্র ৪৪ টি আসনে জয়ী হতে পেরেছিল। তারপর ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ নির্বাচন, যেখানে ৬১.৪৬৮ কোটি ভোটদাতা ভোট দিয়েছিলেন। ভোট পড়েছিল প্রায় ৬৭ শতাংশ। যা ভারতের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড। শুধু তাই নয়, সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাসে সেবারই প্রথম ভোটদাতাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি ছিল। সেবার ৪৩৮.৫ মিলিয়ন নথিভূক্ত মহিলা ভোটারদের মধ্যে ৬৭.১৮ শতাংশ মহিলা ভোট দিয়েছিলেন। পুরুষরা ভোট দিয়েছিলেন ৬৭.০২ শতাংশ। অর্থাৎ মহিলা ভোটদাতাদের তুলনায় পুরুষরা ০.১৬ শতাংশে পিছিয়ে ছিলেন। যদিও পার্থক্যটি সামান্য, কিন্তু গণতান্ত্রিক কর্মযজ্ঞে অধিক সংখ্যায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব সাংঘাতিক। ২০১৯ সালে প্রতি ১০০০ জন পুরুষ পিছু নথিভূক্ত মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল ৯২৬ জন। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেটা বেড়ে হয়েছিল প্রতি ১০০০ জন পুরুষ ভোটার পিছু ৯৪৬ জন মহিলা ভোটার।

খুশি হবার মতো তথ্য যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলেই ভোটদানে মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তার যথেষ্ট কারণ আছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে মহিলাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভা, সব রাজ্যের বিধানসভা এবং 'ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন' দিল্লির বিধানসভাতেও মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্র। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনার বিষয় হয়ে ছিল।

স্বাধীনতার পর থেকে নারীরা ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার পেলেও সংসদ ও বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৩ সালে ভারতীয় সংসদে পাশ হয় 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিল'—যেটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো লোকসভা ও রাজ্যগুলির বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা। দীর্ঘদিন ধরে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা চললেও বাস্তবে তা কার্যকর করার মতো আইন ছিল না। এই আইন কার্যকর হলে সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এই আইন কার্যকরের কথা ভাবা হচ্ছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে দিল্লিতে।

অ্যাক্সিস-মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুসারে, ২০১৯ সালে ৪৬ শতাংশ মহিলা ভোটদানের ক্ষেত্রে বিজেপিকে পছন্দ করেছিল। অন্যদিকে, শতকরা ৪৪ জন পুরুষ বেছে নিয়েছিল বিজেপিকে। অর্থাৎ নির্বাচনে বিজেপিকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু কেন? স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির একটা বড়ো অংশের উপভোক্তা হলেন মহিলা। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার কথা বলতে হয়। এই যোজনায় ছোটো-খাটো ব্যবসার জন্য দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত মোট ৪৩ কোটি মানুষ ব্যবসায় নিযুক্ত হতে পেরেছেন মুদ্রা লোনের বিনিময়ে। যার ফলে সরাসরি ৬৮ শতাংশ মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সবই মোদির মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফিনান্সের সুফল। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের মাইক্রোফিনান্সের বিনিময়ে নতুন করে ৬ কোটি কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যার সুফল জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ পাচ্ছে।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে আসছে। ফলস্বরূপ,সমাজ পরিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে উঠে এসেছেন নারীরা। সঙ্ঘের পঞ্চ পরিবর্তনের আহ্বানের মাধ্যমে নারীর নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমাজ পরিবর্তনে নারীর সক্রিয় ভূমিকাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। □

সুস্থ থাকতে লিভারের যত্ন জরুরি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। সুস্থ থাকতে লিভারের যত্ন জরুরি। তার জন্য দূরে যেতে হবে না, হাতের কাছেই রয়েছে নানা উপাদান। বিভিন্ন ফলের রস ও সবজি যা নিয়মিত খাদ্য তালিকায় থাকলেই হবে। লিভার থাকবে সুস্থ সবল।

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। এর অনেকগুলি কাজ যার মধ্যে প্রধান হলো হজম করানো। লিভার পিত্ত তৈরি করে বা চর্বি হজমে সহায়তা করে। লিভার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট বিপাক করে শরীরে সরবরাহ করে। রক্ত থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ দূর করে শরীরকে পরিষ্কার রাখে। লিভার রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ফ্যাট বিপাক করে শরীরে শক্তি সরবরাহ করে। লিভার রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে। শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জনসংখ্যা লিভারের রোগে আক্রান্ত। যেমন— ফ্যাটি লিভার, হেপাটাইটিস, সিরোসিস, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাট লিভার ডিজিজ ইত্যাদি। মূত্রথলির ক্যানসার থেকে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার সবেরই মূলে রয়েছে এই লিভার। এমনকী কিডনির বিভিন্ন জটিল অসুখের নেপথ্যেও রয়েছে লিভার। লিভার ভালো রাখতে দরকার ডিটক্সিফিকেশন। লিভারকে সুস্থ রাখতে রান্নাঘরেই রয়েছে অনেক কিছু। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ডায়েট এবং কিছু ডিটক্স জুস বা ডিটক্স ওয়াটার রাখুন আপনার রোজকার ডায়েটে।

বিটের রস বা বিটরুট জুস : বিটের রসে রয়েছে খুব উচ্চমাত্রার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বিটালাইন লিভারকে সুস্থ রাখতে খুব কার্যকরী। বিটে রয়েছে উচ্চমানের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা রক্ত পরিশ্রুত করে। একটা বিট, অল্প আদা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। ওই মিশ্রণটি ছেঁকে মধু আধ চামচ, পাতিলেবুর রস এবং সামান্য বিট নুন দিয়ে খান।

অ্যালোভরা জুস : অ্যালোভেরায় রয়েছে অ্যালোইন নামে একটি প্রোটিন যা শরীরে জমে থাকা টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। অ্যালোভেরায় ভিটামিন এ, সি, ই থাকে যা লিভার ভালো রাখতে সহায়তা করে। দিনের যেকোনো সময়ে খেতে পারেন অ্যালোভেরার জুস।

আপেলের জুস : আপেলে থাকা পলিফেনল পেকটিন লিভারের সিরাম ও লিপিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখে। একটি আপেল টুকরো করে সঙ্গে করে নিন। মিশ্রণটি ছেঁকে ওর মধ্যে লেবু, বিটনুন, মিশিয়ে খান।

গাজরের জুস : গাজরের রসে থাকা বিটা-ক্যারোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারকে সুরক্ষিত রাখে। এই পুষ্টি উপাদানগুলি পিত্ত নিঃসরণ বাড়ায় এবং হজমে সহায়তা করতে পারে। গাজরের রস দীর্ঘস্থায়ী ডায়ারিয়া ও বদহজমের সমস্যা কামায়। এটি নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। ফলে লিভারের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন তাঁরা নিয়মিত গাজরের রস খেলে উপকৃত হবেনই।

লেবুর জল : রোজ সকালে লেবুর জল খেলে পিত্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করে। পিত্ত লিভারকে আরও সহজে চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে এবং হজমে সহায়তা করে। লেবুতে ভিটামিন-সি রয়েছে, যা লিভারকে অনেকটা পরিশ্রুত করে, ফলে লিভার টক্সিন-মুক্ত থাকে। একটা পাতিলেবু, একচামচ মধু দিয়ে একগ্লাস জলে মিশিয়ে অল্প বিটনুন ছড়িয়ে খান। যাঁদের লেবুতে অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে তাঁরা অল্প পরিমাণে লেবুর রস মিশিয়ে এই জলটি খান।

আমলকীর জুস : আমলকী, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। আমলকীর রস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস-জনিত ক্ষতির হাত থেকে লিভারকে রক্ষা করে। আমলকীর রস ডিটক্স ওয়াটারের কাজ করে, তাই এটা নিয়মিত খেলে লিভার ও কিডনি দুইই ভালো থাকে। আমলকী টুকরো করে কেটে ব্লেন্ড করে ওই মিশ্রণ ছেঁকে নিন। ওর মধ্যে অল্প মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে খান।

বেদানার জুস : বেদানায় রয়েছে উচ্চমাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিশেষ করে পুনিকালাগিন, অ্যান্থোসায়নিন ও পলিফেনল। কমিপ্লিমেন্টারি থেরাপিজ ইন মেডিসিনের প্রকাশিত গবেষণা অনুসারে বেদানার রস খেলে লিভারের এনজাইমের মাত্রা উন্নত হয় বিশেষ করে যাঁরা স্থূল বা হজমের সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা নিয়মিত বেদানার রস খেলে ভালো ফল মেলে। নন অ্যালেকোহলিক ফ্যাটি লিভার- জনিত সমস্যা প্রতিরোধ করে বেদানা। বেদানা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে অল্প বিটনুন দিয়ে খান।

ব্লুবেরি ও ক্র্যানবেরি জুস : ব্লুবেরি ও ক্র্যানবেরিতে রয়েছে অ্যান্থোসায়ানিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা প্রদাহ কমায় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসজনিত ক্ষতি থেকে লিভারকে রক্ষা করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে ব্লুবেরি ও ক্র্যানবেরি লিভারের ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে এবং ফাইব্রোসিসের ঝুঁকি কমায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ব্লুবেরির নির্যাস লিভার ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি রোধ করে। এক কাপ ব্লুবেরি ধুয়ে নিয়ে এক চামচ ভিনিগার ও আধ চামচ বেকিং সোডায় ভিজিয়ে রাখুন। এরপর তুলে নিয়ে আবার ধুয়ে ব্লেন্ড করে নিন। ওর মধ্যে এক চামচ লেবুর রস মেশান আবার একবার ব্লেন্ড করুন। ওপরে বিটনুন ছড়িয়ে খান।

সবজি : ব্রকোলি, ফুলকপি এবং ব্রাসেলস স্প্রাইট থাকা যৌগ লিভারের এনজাইমগুলিকে সক্রিয় করে। এই এনজাইমগুলি শরীরের টক্সিন অপসারণের সহায়তা করে। একটি গবেষণা বলছে ব্রকোলি ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকিও কমাতে পারে।

চর্বিমুক্ত মাছ : বিভিন্ন চর্বিযুক্ত মাছ যাতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যেমন স্যামন, সার্ডিন, টুনা, কাতলা, ইলিশ খাদ্য তালিকায় পরিমাপ মতো রাখুন।

এই হেলদি ফ্যাটগুলি লিভারের প্রদাহ কমাতে এবং চর্বি জমা রোধে সাহায্য করে। গবেষণা অনুযায়ী ওমেগা-৩ লিভারের সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের লিভারের চর্বি এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। সবশেষে বলি, এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে সুফল পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত আর্থিক মুনাফাই হলো মার্কিন যুদ্ধ অর্থনীতির মূল ভিত্তি

পূর্ব রায়চৌধুরী

বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমরা লক্ষ্য করছি পৃথিবীজুড়ে এক সামরিক অস্থিরতা। গত কয়েক মাসে আমরা তারই উদাহরণ দেখেছি আমেরিকার অবাঞ্ছিত আগ্রাসনে, ভেনেজুয়েলা ও ইরানের ওপর আক্রমণে। কিন্তু কেন এই আগ্রাসন, এই যুদ্ধ পরিকল্পনা? এটা সঠিক ভাবে জানতে হলে আমেরিকার অর্থনীতিকে একটু বুঝতে হবে। আমেরিকার রাজস্বের বেশিটাই আসে বিভিন্ন অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রি করে। এই প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের মধ্যে যেমন থাকে ফাইটার জেট, যুদ্ধ জাহাজ, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, ট্যাঙ্ক, রাডার, রকেট লঞ্চার; ঠিক তেমনি থাকে গোলা, বারুদ, বন্দুক, এমনকী সৈন্যদের ব্যবহারযোগ্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটও। গত কয়েক বছরে এই মার্কিন রপ্তানি বার্ষিক ১০-১৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করেই আমেরিকা কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে, যা তাদের দেশের নিজস্ব রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

পৃথিবীজুড়ে অস্ত্র রপ্তানির বাজার যে সুবিশাল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু গত কয়েক বছরে আরও কিছু দেশ বিশেষত চীন সেই বাজারে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। আমেরিকা এই বাজারে নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির হার বজায় রাখা বা আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য কিছু প্রযুক্তিগত সংস্থা এবং কিছু সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থায় সরাসরি বিনিয়োগ করেছে। যুদ্ধাস্ত্রের গুণমান সবচেয়ে ভালোভাবে পরীক্ষিত হয় যুদ্ধে। ভারতের অপারেশন সিঁদুর এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, চীনের তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সহজেই এড়িয়ে গিয়ে ইচ্ছামতো বিমান হানা করা যায়। অর্থাৎ চীনের এই সিস্টেম চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ। ওদিকে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট অপহরণ বা ইরানে খোমেইনির মৃত্যু আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্রের অব্যর্থ নিশানাকেই সকলের সামনে নিয়ে এসেছে।

অতএব আমেরিকার আগ্রাসনের পিছনে সামরিক সরঞ্জাম বাজারের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এটা একমাত্র কারণ হতে পারে না। এবার দেখতে হবে কোথায় কোথায় আমেরিকা আগ্রাসন চালিয়েছে। প্রথমে ভেনেজুয়েলার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। সবাই জানে ওখানে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল আছে আর আছে রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট। ইরানের খনিজ তেল উৎপাদনের কথাও কারুর অজানা নয়। আমেরিকা এই দুই দেশের ওপর অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ও রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যাতে এরা খনিজ তেলের বাজারে ঢুকে বিশ্ববাজারে দাম না কমিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকা একটি বৃহৎ খনিজ তেল রপ্তানিকারক দেশ। খনিজ তেল সে দেশে যে শিল্প তৈরি করেছে, উত্তোলন থেকে রপ্তানি বা পরিশোধন পর্যন্ত, তার সামগ্রিক আয় ২.৫ থেকে ৩ ট্রিলিয়ন ডলার।

অপরিশোধিত তেলের মূল্য হ্রাস তার রাজস্বের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। যদি সমগ্র পৃথিবীর অপরিশোধিত তেল উৎপাদক দেশগুলোর দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি যেমন ইরান, ইরাক, কাতার, সৌদি আরব, বাহরিন, লেবানন সবাই তেলের ওপরে ভাসছে। আর তাই যে ব্যক্তি বা দলই সরকারে আসুক আমেরিকা সবসময়ই এই অঞ্চলে অশান্তি জিইয়ে রাখতে চাইবে। আমরা যদি ইতিহাসের কথা ভাবি তাহলে ইরাকের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধও কিন্তু সুদূর অতীত নয়। বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একাই যুদ্ধের রাস্তায় হাঁটছেন এমনটা কিন্তু নয়। আমরা দেখেছি পূর্বতন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আমেরিকান সৈন্য ইরাক ও আফগানিস্তানে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার যুদ্ধকালীন অবস্থাকে জিইয়ে রাখার জন্য। এছাড়াও সুদান, লিবিয়া সর্বত্র সেনা পাঠিয়ে ও বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ করে পশ্চিম এশিয়ার খনিজ তেল সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অস্থিরতা কায়েম রেখেছিলেন। ট্রাম্প ও ওবামা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সম্ভবত আমেরিকার প্রায় সকল রাষ্ট্রপতি (বর্তমান ও প্রাক্তন) একই ধরনের কাজ করেছেন।

খনিজ তেল, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আর তাদের বিশাল বাজার নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এবার একটু দেখা যাক এই দুই বাজারের বিশালতা কীসের জন্য। জ্বালানি বললে আমাদের দেশে আগে লোকে কাঠ, কয়লা, ঘুঁটের কথা ভাবত, এখন এলপিজি-র কথা ভাবে। গ্রামের লোকও গাড়ি বলতে চার চাকার কথাই ভাবে, গোরুর গাড়ি ভাবে না। এই ভাবনাটা কিন্তু বিশ্বজনীন। তাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেশকেও খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেনার অর্থ জোগাড় করতেই হয়। আর প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম না কিনতে পারলে সার্বভৌমত্ব রক্ষার কোনো জায়গাই নেই।

ভারত কিন্তু খুব খারাপ অবস্থায় নেই। এখন দর কষাকষির একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে বর্তমান ভারত। তাই হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল আনতে পারছে আমাদের দেশ।

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের কী অবস্থান হওয়া উচিত?

ডাঃ মধুসূদন পাল

দীর্ঘদিন ধরেই পরমাণুশক্তিধর দেশ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে ইরান। ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট ও পরমাণু বোমা তৈরির গোপন প্রকল্প চালানোর অভিযোগ এনে ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর ১৩ জুন আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে শুরু হয় ইরানের সংঘাত। ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলি ধ্বংসের লক্ষ্যে ইজরায়েল শুরু করে ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’। ১২ দিন ধরে আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলার পর হয় সাময়িক সংঘর্ষবিরতি। এ বছর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম এশিয়ায় যে যুদ্ধ পরিস্থিতির পুনরায় সূত্রপাত, তার কারণ হলো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে গোপনে ইরানের পরমাণু প্রকল্প পরিচালনা। এছাড়াও ইরানে মোল্লাতন্ত্রের শাসন অবসানও আমেরিকার অঘোষিত লক্ষ্য। ইরানের পরমাণু বোমা তৈরি রুখতে আমেরিকা- ইজরায়েল যৌথ আক্রমণ চালায় ইরানের ওপর। সিআইএ ও মোসাদের সরবরাহ করা গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, স্টেলথ্ ফাইটার বোম্বার এয়ারক্র্যাফ্ট ব্যবহার করে প্রিসিশন স্ট্রাইক চলে ইরানের ইস্পাহান-সহ বিভিন্ন নিউক্লিয়ার সাইটে। মাটির নীচে থাকা পরমাণু কেন্দ্রগুলি লক্ষ্য করে বাঙ্কার ব্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করা হয়। প্রথম ২৪ ঘণ্টাতেই ইজরায়েল ও আমেরিকার সুনিপুণ আক্রমণে এক গোপন বাঙ্কারে আলোচনারত অবস্থায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আয়াতুল্লা খোমেইনি-সহ প্রায় ৩৫-৪০ জন সর্বোচ্চ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব একসঙ্গে নিহত হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ। এটা প্রমাণ করে যে, ইরানের সরকারি মহলের মধ্যেই ইজরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদ বা আমেরিকার গোয়েন্দা বাহিনী সিআইএ-র গভীর অনুপ্রবেশ রয়েছে। আয়াতোল্লা খোমেইনি-র মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশের সর্বোচ্চ নেতার পদে আয়াতোল্লা খোমেইনির পুত্র মুজতবা খোমেইনি-র নাম ঘোষণা করে তেহরান প্রশাসন।

ইরানও পালটা আক্রমণ শুরু করেছে ইজরায়েল ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশগুলির সেইসব জায়গায় যেখানে আমেরিকা ও ইজরায়েলি সেনাবাহিনী, মার্কিন এয়ারবেস (বিমানঘাঁটি), গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র এবং খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারগুলি রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ইরান প্রত্যাঘাত করেছে— ইরাক (কুর্দিস্তান, আর্বিল), ইজরায়েল, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, আবু ধাবি, সৌদি আরব, রিয়াধ, বাহরিন, দুবাই, কাতার ও কুয়েতে। হরমুজ প্রণালী হলো একটি সরু জলপথ যা পশ্চিমের পারস্য উপসাগরকে পূর্বে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিশ্বজুড়ে সরবরাহ হওয়া খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বড়ো অংশ অসংখ্য জাহাজের মাধ্যমে যায় এই হরমুজ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে। ফলে এই প্রণালী হলো সমগ্র বিশ্বের ‘লাইফ লাইন’। যুদ্ধের

শুরুতেই হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে দেয় ইরানের নৌসেনা। ফলে বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সাইপ্রাসের ওপরও আক্রমণ শানিয়েছে ইরান। এখানে গ্রিসের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত। গ্রিস ইউরোপের অন্যতম দেশ হওয়ার কারণেই ইরানের পক্ষ থেকে এই আক্রমণ। ইরানের সেনাবাহিনী আঘাত হানছে সমস্ত তৈল শোধনাগার এবং অপরিশোধিত তেলের ডিপোগুলির ওপর। ইরানের ওপর আঘাত অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আরব সাগরে বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন এবং লোহিত সাগরে বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ডকে মোতায়েন করে আমেরিকা। গত ২ মার্চ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর অফিস ও ইজরায়েলের এয়ারফোর্স হেডকোয়ার্টার্স লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে বলে দাবি করে ইরানের সেনাবাহিনী রেভোলিউশনারি গার্ডস্। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে গত ৩ মার্চ, 'মিনিটম্যান-৩' ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইসিবিএম) পরীক্ষা করে আমেরিকার এয়ারফোর্স গ্লোবাল স্ট্রাইক কমান্ড। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানার মাধ্যমে এই 'ডুমস্ ডে মিসাইল' পরীক্ষা সফল হয়েছে বলেও জানায় আমেরিকা। গত ৪ মার্চ ইরানের যুদ্ধজাহাজ আইআরআইএস ডেনা-কে টর্পেডোর আঘাতে ভারত মহাসাগরে ডুবিয়ে দেয় একটি মার্কিন সাবমেরিন। দক্ষিণ শ্রীলঙ্কা থেকে ৪৪ নটিকাল মাইল (৮১ কিলোমিটার দূরে) এই ঘটনাটি ঘটে। ৮০ জন নাবিক ও ইরানীয় নৌসেনা-সহ যুদ্ধজাহাজটির সলিলসমাধি ঘটে। ভারতের পূর্ব উপকূলে বিশাখাপত্তনমে যুদ্ধজাহাজটি 'মিলন'-নামক দ্বিবার্ষিক, আন্তর্জাতিক নৌমহড়ায় অংশগ্রহণ করে। ইরানে ফিরে যাওয়ার পথে জাহাজটিতে আক্রমণ চালায় মার্কিন সাবমেরিন। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড পরিচালনা করলেও যুদ্ধজাহাজটিকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করাটা ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের কাজ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। গত ৬ মার্চ আজারবাইজান দাবি করে যে, বাকু-তিবিলিসি-সেহান (বিটিসি) অয়েল পাইপলাইন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ইরানের সেনাবাহিনী 'ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস্' (আইআরজিসি)। যদিও আজারবাইজানের দাবিকে ইজরায়েলের ফলস্ ফ্ল্যাগ অপারেশনের একটি নমুনা বলে দাবি করে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম। গত ৭ মার্চ, ইরান দাবি করে যে, কেশম দ্বীপে (Queshm Island) অবস্থিত তাদের একটি ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট (লবণমুক্তকরণের মাধ্যমে জল পরিশোধন কেন্দ্র)-কে বোমাবর্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক পরিকাঠামোর পরিবর্তে সিভিলিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আমেরিকা টার্গেট করছে বলে অভিযোগ করে ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টে সংঘটিত মার্কিন আক্রমণকে 'জঘন্য যুদ্ধাপরাধ' আখ্যা দেয় ইরান। ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আশঙ্কা এই ঘটনার পর ইরান যদি মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিভিন্ন ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টকে তাদের প্রতি-আক্রমণের নিশানা করে, তবে পশ্চিম এশিয়া জুড়ে দিতে পারে তীব্র পানীয় জলের সংকট।

গত ৭ মার্চ একটি রেকর্ডেড বক্তৃতা সম্প্রচারের মাধ্যমে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান দুঃখ প্রকাশ এবং প্রতিবেশী আরব দেশগুলির (বাহরিন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার ও ওমানের) প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের জোড়া ফলা হামলার ক্ষেত্রে এই আরব দেশগুলিতে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে বলে তারা ওই ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। গত ৮ মার্চ সৌদি আরবে মার্কিন বাহিনীর অধীন আল-খার্জ এয়ারবেস ও প্রিন্স সুলতান এয়ারবেসে আক্রমণ চালায় আইআরজিসি। বিমানঘাঁটিতে থাকা মার্কিন এফ-৩৫, এফ-১৬ যুদ্ধবিমানগুলি ধ্বংস করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। গত ১৩ মার্চ পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ইরানের খার্গ দ্বীপপুঞ্জে লাগাতার বোমাবর্ষণ করে তীব্র আক্রমণ চালায় মার্কিন বিমানবাহিনী। গত ১৭ মার্চ ইজরায়েলি বিমানহানায় ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি নিহত হন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ওইদিনই বহুজাতিক সংস্থা 'অ্যাপল্'-এর 'দ্য দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স সেন্টার' বা ডিআইএফসি-তে ড্রোন হামলা চালায় ইরান। তাদের এই হামলার কবলে পড়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-স্থিত আমাজন ওয়েব সার্ভিসেস ডেটা সেন্টারও। উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে (যার মধ্যে অ্যাপল্, গুগল্, মাইক্রোসফট্ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত) হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। সংস্থাগুলির পরিকাঠামোকে টার্গেট করে তারা আক্রমণ চালাতে পারে বলেও সতর্কবার্তা জারি করেছে। গত ১৮ মার্চ ইরানের 'সাউথ পার্স' প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রে হামলা চালায় ইজরায়েল। এর পালটা

প্রতিক্রিয়ায় গোটা উপসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হানা দেয় ইরান। গত ১৯ মার্চ হাইফায় তেল শোধনাগারে ইরান ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালিয়েছে বলে জানান ইজরায়েলের জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী এলি কোহেন। ওইদিনই কাতারের রাস লাফান শিল্পনগরীতে হামলা চালায় ইরান। বিপুল প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারের ওপর অবস্থিত কাতারের এই শিল্পনগরী। এই হামলার ফলে কাতারের লিক্যুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানি প্রায় ১৭ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এর ফলে ইউরোপ, এশিয়া-সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এলএনজি সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। গত ১৮ ও ২০ মার্চ জেরুজালেমে ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালায় ইরান। এরপরই ইজরায়েলি সেনাবাহিনী 'দ্য ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস্' (আইডিএফ) তেহরানের ওপর একাধিকবার বিমানহানা চালায়। ইরানের দক্ষিণ পার্স গ্যাসক্ষেত্রে ইজরায়েলি হামলার পর উপসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে জ্বালানি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে আক্রমণের ক্ষেত্রে তাদের সামরিক শক্তির 'সামান্য একটি অংশ' ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে, ইরানের জ্বালানি ভাণ্ডারগুলিকে লক্ষ্য করে আমেরিকা ও ইজরায়েল ফের হামলা চালালে ইরানও কোনোরকম সংযম প্রদর্শন করবে না। আমেরিকা ইরানের বুকে হানাদারি অব্যাহত রাখলে আগামী ৬ মাস থেকে ১০ বছর পর্যন্ত আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার ক্ষমতা ইরানের রয়েছে বলে জানান তিনি। আমেরিকা ক্ষমা প্রার্থনা করলে, যুদ্ধের সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিলে এবং ইরানের বিরুদ্ধে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে আলোচনা শুরু হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সৌদি আরবের তেল কোম্পানি আরামকো-র তৈল শোধনাগারে ইরানের হামলার পর গত ৭ মার্চ সেদেশ সফরে যান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনাপ্রধান আসিম মুনির। সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালেদ বিন সলমন তাদের একটি চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সৌদি আরবের ওপর কোনো সামরিক আক্রমণ হলে দেশটিকে সবরকম সামরিক সহযোগিতা দানে অঙ্গীকার করে আগের বছর চুক্তিবদ্ধ হয় পাকিস্তান। ইরানের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে জড়াতে অপারগ বলে এই বৈঠকে জানান পাক প্রধানমন্ত্রী। অর্থনীতির বেহাল অবস্থা এবং আফগানিস্তানের তালিবান ও বালোচ মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধে জড়িয়ে থাকার দরুন পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের তৃতীয় ফ্রন্টটি এই মুহূর্তে তারা খুলতে পারছেন না বলে জানিয়ে দেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত খরচ সামলানোর জন্য গত ১৮ মার্চ হোয়াইট হাউসের কাছে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার চেয়ে পাঠায় পেন্টাগন। মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন আদায়ের ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউস প্রয়াস চালাচ্ছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধের ব্যাপারে দু'বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেন 'প্রেডিক্টিভ হিস্ট্রি'র অধ্যাপক জুয়েকিং জিয়াং। বেজিঙে দর্শন ও ইতিহাস পড়ান তিনি। ২০২৪ সালের মে মাসের একটি বক্তৃতায় জিয়াং জানিয়েছিলেন যে, আমেরিকায় ক্ষমতায় ফিরবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবং তারপর ভূ-রাজনৈতিক চাপের কারণে ইরানের সঙ্গে সম্মুখসমরে নামতে বাধ্য হবেন তিনি। আমেরিকা, ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাত নিয়ে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক, কৌশলগত বিষয় ও ভূ-রাজনীতির বিশ্লেষক এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন।

আমেরিকা ও ইজরায়েলের অস্ত্রগুলি অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে। সেজন্য ইজরায়েল ও আমেরিকার আঘাতগুলি ইরানের ওপর জোরালো ও সুনির্দিষ্টভাবে পড়ছে। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের ওপর ইরানের আঘাত সংখ্যায় বেশি হলেও তা অতখানি সুনির্দিষ্ট নয়। ফলে শত্রুদেশের বিরুদ্ধে ইরানের প্রত্যাঘাতজনিত প্রতিক্রিয়া অনেকটাই কম। মোদ্দা কথা, আমেরিকা ও ইজরায়েল সরাসরি তাদের লক্ষ্য (টার্গেট) হিসেবে এখনও রেখেছে ইরানকে, তার সমর্থনকারী চীন ও রাশিয়াকে নয়। অন্যদিকে ইজরায়েল ও আমেরিকার ওপর আঘাত হানতে গিয়ে পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিকেও শত্রু করে ফেলেছে ইরান। ইরানের শাসক শিয়া হলেও পারস্য উপসাগরের অন্যান্য দেশগুলিতে প্রধানত সুন্নিরাই শাসক। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি মূলত খ্রিস্টান-প্রধান, যেখানে পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত খ্রিস্টান দেশগুলির স্বার্থ জড়িত। অর্থাৎ ইরান ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শত্রুর সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে ফেলেছে। এটা তাদের কূটনৈতিক পরাজয়। একই ধরনের কূটনৈতিক ভুল হিটলার করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে রাশিয়াকে আক্রমণ করে। যুদ্ধ করার উপকরণ ও নিজস্ব রিসোর্স সীমিত হলে কোনো বুদ্ধিমান সমরনায়ক যুদ্ধে শত্রু সংখ্যা বাড়ায় না বা একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্রন্টে যুদ্ধ করে না। আমেরিকা, ইজরায়েল ও ইরান কেউই ধোওয়া তুলসীপাতা নয়। সবারই অনেক খুচরো পাপ ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তে হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি এসে পড়েছে বিশ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আট দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ সংকট তৈরি হয়েছে। এর আগে বিভিন্ন যুদ্ধ বা আঞ্চলিক সংঘাতে কিছু দেশ জড়িয়ে পড়লেও কখনই একসঙ্গে এত দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ইউরোপেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রগুলোও প্রধানত ছিল ইউরোপের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ইউরোপে হলেও জাপানের অংশগ্রহণে

বর্তমান যুদ্ধ

ভারত কি এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকবে? যদি নিরপেক্ষ অবস্থান নেয় ভারত, তবে সেই নিরপেক্ষতার অর্থ কি? সে কি উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস নেবে না? নিরপেক্ষ থাকলে কি তেল পাওয়ার গ্যারান্টি থাকবে? এই তেল আসা নির্ভর করছে উপসাগরীয় অঞ্চলের হরমুজ প্রণালীর দু'দিকের শক্তিগুলোর সহযোগিতার ওপর। এর একদিকে রয়েছে ইরান, অন্যদিকে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমান।

সুতরাং নিরপেক্ষ কিংবা কোনো পক্ষ অবলম্বনেও ভারতের সরাসরি লাভ নেই। তবে উপসাগরীয় দেশগুলিতে গুগল্, মাইক্রোসফট্, অ্যাপল্-এর মতো 'ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার' সংস্থাগুলির যে 'গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ ডেটা সেন্টার্স' রয়েছে, সেগুলির ওপর ইরানের

তা এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য। এবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকট দেখা দিয়েছে এশিয়াতে। বিশেষত পশ্চিম এশিয়ার খনিজ তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলে, যেখানকার তেল সমগ্র পৃথিবীর প্রধান চালিকাশক্তি। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক স্বার্থ এখানে জড়িত।

মুসলমানদের জন্মসূত্রে পাওয়া, ১৩০০ বছরের পুরোনো শিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব এই অঞ্চলে অতি প্রখর। এই দ্বন্দ্ব যেমন এদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে, তেমনই সেটা ব্যবহার করছে বহির্শক্তিরাও। মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে সে শিয়া বা সুন্নি যাই হোক, কারুর মধ্যে না আছে পরিপক্ক রাষ্ট্রনীতিবোধ কিংবা মানবিক মূল্যবোধ। নেই গণতন্ত্রও।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বিগত আট দশকে যত সংকট তৈরি হয়েছে, বিশ্বশক্তিগুলো প্রতিক্ষেত্রেই খুব সচেতনভাবে তাকে সংহত করেছে। সমস্ত উদ্যোগ তারা নিয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ যাতে না তৈরি না হয় সেজন্য। কিন্তু বর্তমানে ভারত ব্যতিরেকে কোনো বিশ্বশক্তিই এটাকে থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না। এটা দুর্ভাগ্য যে, প্রত্যেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে নিজ স্বার্থরক্ষায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই অবিলম্বে যুদ্ধ থামানো এবং দ্বিপাক্ষিক / বহুপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানসূত্র সন্ধানের ওপরেই জোর দিয়েছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁরা বারবার বলেছেন যে, এটা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রগতির যুগ। শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সমৃদ্ধি অর্জন তো দূর অস্ত, বিশ্ব অর্থনীতিতে নেমে আসতে পারে ঘোর দুর্যোগ। যদিও সাম্প্রতিক সংঘাতের প্রধান খেলোয়াড়রা অত্যন্ত আগ্রাসী, অন্য কারুর সদ্‌উপদেশ তারা শুনতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়।

ইজরায়েলের আঘাতে প্রথম পর্যায়ে ইরানের উপরের দিকের নেতৃত্ব খতম হলেও দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা করে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে অনেক বড়ো 'সাক্সেশন প্ল্যান' বানিয়েছে ইরান। ফলে এক বা একাধিক নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটলেও তাদের শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটানো বেশ দুরূহ। শীর্ষ নেতৃত্ব খতম হলেও নীচের স্তরগুলি অতি দ্রুত সেই শূন্যস্থান পূরণ করছে। নেতৃত্বের সিঁড়ির পরবর্তী স্তরগুলি মনোবল রক্ষা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় যুদ্ধ তৃতীয় সপ্তাহে পড়েছে। আমেরিকা-ইজরায়েলের কাছে এটা হিসেবের বাইরে। যুদ্ধে দুই পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, যদিও ইরানের ক্ষতি বেশি। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলি বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে। ইরানের কাছেও হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ মিসাইল রয়েছে বলে খবর। সেই মিসাইল নিক্ষেপ করে তারা মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর সলিলসমাধি ঘটাতে পারে বলেও মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। এখনও পর্যন্ত কিন্তু পদাতিক বাহিনী ব্যবহারের সাহস দেখায়নি আমেরিকা বা ইজরায়েল। পদাতিক বাহিনী ব্যবহার ছাড়া যুদ্ধ শেষ করা যাবে না। যুদ্ধ প্রলম্বিত হচ্ছে, যেটা আমেরিকা ও ইজরায়েলের কাঙ্ক্ষিত নয়। আমেরিকা চাইছে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত দেশ এই যুদ্ধে তাদের পাশে এসে দাঁড়াক। ট্রাম্পের বক্তব্য হলো, যেহেতু ন্যাটো-র জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাই ন্যাটো দেশগুলোর

পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান কী?

আক্রমণ অব্যাহত থাকলে, আগামীদিনে তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলির গন্তব্যস্থল হয়ে উঠতে পারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। এই সংস্থাগুলি ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করলে এবং এখানে তাদের ডেটা সেন্টার স্থাপন করলে তাদের জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় অর্থবাজেটে করছাড়ের ঘোষণা করেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

এটা ঠিক যে, ইরানের চাবাহার বন্দর নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতের আর্থিক লগ্নি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার পিছনে বিভিন্ন কৌশলগত দিক রয়েছে। কিন্তু বৈরীমনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী দেশ পরিবৃত ভারত ইজরায়েলের কাছ থেকে যে উচ্চমানের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তি বন্ধুত্বপূর্ণ শর্তে পেয়ে থাকে, সেটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ থেকে পাওয়া যায় না। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা কি ভারতের দেশীয় স্বার্থেই জরুরি নয়? যেকোনো যুদ্ধ সংকটে প্রতিবারই যে দেশ সবথেকে নিপুণ অস্ত্র ভারতকে দিয়ে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে, তার নাম—ইজরায়েল। সুতরাং যেকোনো পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখা ভারতের জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য। ইরান হলো শিয়া অধ্যুষিত দেশ। ইজরায়েলের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সুন্নি শাসনের দেশগুলোর বন্ধুত্ব হারাবে না ভারত। এক্ষেত্রে শুধু সম্পর্কের অবনতি ঘটবে ইরানের সঙ্গে।

এই ঝুঁকি হয়তো নিতেই হবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। সকলের প্রার্থনা হলো, এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হোক। ইরানে দ্রুত শুরু হোক মানবিক শাসন। অটুট থাকুক ভারতের সঙ্গে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক।

ফঃ ৪

যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত। এই দেশগুলি সহযোগিতা না করলে, আমেরিকা ভয় দেখাচ্ছে যে সে ন্যাটোকে আর কোনো সাহায্য করবে না। অর্থাৎ ন্যাটো-র দেশগুলো আগামীদিনে রাশিয়ার আক্রমণের মুখে পড়লে অরক্ষিত হবে। অন্যদিকে ইউকে (ব্রিটেন), জার্মানি, ডেনমার্ক, ইতালি, গ্রিস-সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরা মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার। হরমুজ প্রণালী ইরানের অবরোধমুক্ত করতে বা নৌবহর পাঠাতে তারা অসম্মত হয়েছেন।

ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোকে আমেরিকা চায় ভাড়াটিয়া সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করতে। অতীত ইতিহাসের গর্বে গর্বিত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো ধীরে ধীরে মার্কিন দাদাগিরির বিরুদ্ধে কথা বলতে একটু সাহস দেখাচ্ছে। গ্রিনল্যান্ড-সহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে মার্কিন নীতির কারণে ন্যাটো-র মধ্যে রীতিমতো ভাঙন ধরছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটে দ্য ওয়ারশ' প্যাক্টের। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক-সামরিক জোটের অবসানের কারণে এর পরবর্তী পর্যায়ে ন্যাটো-রও প্রাসঙ্গিকতা ফুরোতে চলেছে বলে ভেবেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞ। তা কিন্তু এতদিন হয়নি। বর্তমান বিশ্বের ভু-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখা যাক কী হয়। হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ার জন্য সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ প্রায় বন্ধ। এই সমস্ত দেশগুলোর আর্থিক অবস্থা আঘাত পাচ্ছে। জ্বালানির অভাবে প্রভাবিত হচ্ছে দেশগুলির শিল্পক্ষেত্র। এর ফলে বিশ্বজুড়ে পরোক্ষে এক চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সাতটি দেশ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইরানের ড্রোন আক্রমণের ফলে। তাদের খনিজ তেল ও তেলজাত বিভিন্ন দ্রব্য সমুদ্রপথে বিশ্ববাজারে না যাওয়ার জন্য এই দেশগুলির আর্থিক অবস্থাও দুর্বল হচ্ছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরান ছাড়া সবাই সুন্নি শাসনভুক্ত। একদা শিয়া-শাসিত সিরিয়াও আজ মার্কিন পরাভূত। আমেরিকার পুরোনো মিত্র দেশগুলোর (জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া) কেউই আজ আমেরিকাকে সামরিক দিক থেকে যুদ্ধে সাহায্য করতে আগ্রহী নয়। তাদের সবার বক্তব্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ শুরুর আগে তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি। এখনও পর্যন্ত আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের যা পরিস্থিতি, তাতে এটা স্পষ্ট যে ভিয়েতনামের পরে আফগানিস্তানে আমেরিকার যা অবস্থা হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পা রাখার আগে আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার যা হাল হয়েছিল এবং ইউক্রেনে বর্তমানে রাশিয়ার যা অবস্থা— ঠিক সেই দিকেই চলেছে উপসাগরীয় ঘটনাপ্রবাহ। বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে আর একটা সম্ভাবনা হলো ইরান কয়েক টুকরো হতে পারে।

নিজেদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ সুরক্ষিত রেখেছে ইরান। দেশের এই অংশে এয়ার ডিফেন্স বেশ মজবুত ও আঁটোসাঁটো। এখনও পর্যন্ত অনেকগুলি মার্কিন এফ-১৬ ফাইটার জেট গুলি করে নামিয়েছে বলে তারা দাবিও করেছে। পর্বত ও মালভূমি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে মাটির অনেক নীচে তারা 'মিসাইল সিটি' তৈরি করে রেখেছে বলেও খবর। এই অঞ্চল থেকেই পরিচালিত হচ্ছে ইরানের যাবতীয় প্রতি-আক্রমণ। আমেরিকা ও ইজরায়েল তেহরান দখল করলেও ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে তাদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত থাকতে পারে। বর্তমানে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কাস্পিয়ান সাগর উপকূলে আমিরাবাদ ও আনজালি এবং দেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত 'বন্দর আব্বাস'-এর মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন অব্যাহত রয়েছে ইরানের। উপসাগরীয় দেশগুলিকে প্রত্যাঘাতের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'শাহেদ' ড্রোন ব্যবহার করছে ইরান। রাশিয়াতে এই ড্রোন তৈরির কারখানা রয়েছে। সেখানে উৎপাদিত ড্রোনগুলি রাশিয়া থেকে জাহাজের মাধ্যমে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এসে পৌঁছাচ্ছে। কাঠ দিয়ে নির্মিত হওয়ার কারণে ড্রোনগুলির রাডার সিগনেচার প্রায় থাকে না। এই কারণে আকাশপথে হামলার ক্ষেত্রে ড্রোনগুলি বিশেষ কার্যকরী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো পেট্রো-ডলারের আধিপত্য রক্ষা এবং চীনকে দুর্বল করা। ইজরায়েলের লক্ষ্য— নিজের অস্তিত্ব রক্ষা এবং ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধি। যদি ইরান দুর্বল ও খণ্ডিত হয়, তবে বহু শতাব্দী ব্যাপী অবদমিত কুর্দ জাতির পুনরুত্থান এবং কুর্দিস্তানের পুনর্জন্মেরও সম্ভাবনা রয়েছে। যুদ্ধ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে মার্কিন অর্থনীতিতেও ঘনিয়ে উঠতে পারে সংকট। বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা দেখা দেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যুদ্ধে বহুসংখ্যক মার্কিন সেনার প্রাণহানি ঘটলে আমেরিকা জুড়ে গণবিক্ষোভের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইরান তাদের প্রতি-আক্রমণে অনেক ক্ষেত্রেই ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করছে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ হয়তো এই যুদ্ধে সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইরান গোপনে পরমাণু বোমা বানিয়ে ফেললে পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে। চীন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া প্রত্যক্ষভাবে ইরানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে যোগ না দিলেও চীন ইরানকে গোপনে রিয়েল টাইম স্যাটেলাইট ইমেজারি এবং মিসাইল ট্র্যাজেক্টরি ডেটা ও লিঙ্ক সরবরাহ করছে বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। ইরানের কাছে নিজস্ব উপগ্রহ নেই। তা সত্ত্বেও তারা কীভাবে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে সেই প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। তবে চীনা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে দেশের বিস্তীর্ণ অংশকে মার্কিন হামলার হাত থেকে রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে ইরান। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আয়াতুল্লা খোমেইনি-র মৃত্যুর পর ইরান থেকে জারি হওয়া কিছু গোপন সংকেতমূলক বার্তা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি শনাক্ত করেছে বলে জানিয়েছে কিছু সংবাদমাধ্যম। বার্তাগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ইরানের স্লিপার সেলগুলিকে সক্রিয় করার ইঙ্গিত রয়েছে। এই 'অপারেশনাল ট্রিগার সিগনাল'-এর বিষয়টি সত্যি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে আগামীদিনে কোনো নাশকতামূলক ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ইউক্রেন যুদ্ধে লাভবান ছিল চীন। বর্তমান পশ্চিম এশিয়া সংকটে, রাশিয়ার পর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে আপাতত বাধ্য হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটা রাশিয়ার লাভ। তৈল সংকটে পড়ে চীনের কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ইরানের খোমেইনি নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন এবং সেই সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেকগুলি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রয়েছে চীনা কমিউনিস্ট সরকারের। ভারতকেও এই যুদ্ধে টেনে নামানোর অপচেষ্টা চলছে। পরিপক্ব পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে ভারত হয়তো অচিরেই এই সংকট কাটিয়ে উঠবে। ■

হতাত্মা প্রশান্ত মণ্ডলের স্মরণসভা

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুরারীপুর শাখায় হুতাত্মা প্রশান্ত মণ্ডলের স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এদিন হিলি খণ্ডের ১৯টি গ্রাম থেকে স্বয়ংসেবকরা মুরারীপুর শাখায় সমবেত হন। বিকেলে তারা একটি বৈঠকে মিলিত হন। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রদীপ সাহা, জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন, জেলা কার্যবাহ শুভঙ্কর নাথ, জেলা সম্পর্ক প্রমুখ সুরভ বর্মন এবং জেলা প্রচারক বাপী রাজবংশী। বৈঠকে সেবাকাজের জন্য গত বছরে কী কী যোজনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে পর্যালোচনা হয়। আগামী বছরের পরিকল্পনা করা হয়। বিকেল সাড়ে চারটায় স্মরণসভা শুরু হয়। ধ্বজোত্তোলনের পর 'হুতাত্মা প্রশান্ত মণ্ডল' নামাঙ্কিত স্মৃতি ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন। স্মৃতিচারণ করেন ত্রিমোহিনী শাখার স্বয়ংসেবক উদয় প্রামাণিক। সভায় সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্তের প্রেরিত বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর সমবেত গীত, অমৃতবচন, সুভাষিত, একক গীতের পর বৌদ্ধিক বক্তব্য রাখেন জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন। স্মরণসভা পরিচালনা করেন সঙ্ঘের হিলি খণ্ড কার্যবাহ রঞ্জন মালী। সঙ্ঘের প্রার্থনার পর স্মরণসভার সমাপ্তি হয়।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কৃষক সম্মেলন

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৬ মার্চ মালদহ জেলার গাজোল সরস্বতী শিশুমন্দিরে গাজোল থানার কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সদস্য কল্যাণ মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, মালদা জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সহ-সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার, জেলা সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ জয়প্রকাশ বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত সেবা প্রমুখ দীপঙ্কর কমল বর্মা, জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ শচীন রায় প্রমুখ।

মালদায় গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

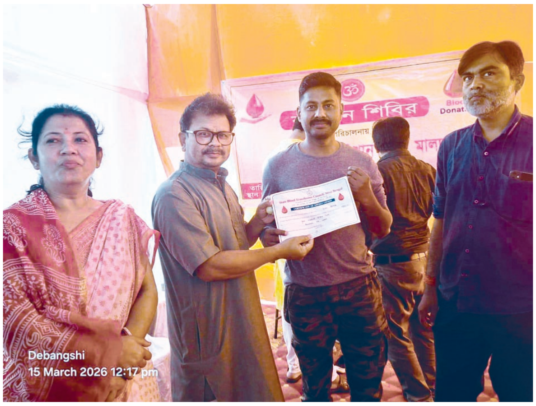

গত ১৫ মার্চ মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মোড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩২ জন রক্ত দান করেন।

মালদা শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সাহা, সঙ্ঘের মালদা বিভাগ সঙ্ঘচালক পীযূষকান্তি সাহা, ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রামেশ্বর পাল প্রমুখ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। উদ্যোক্তারা জানান, এই শিবির গত ২৫ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্মেলন

গত ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি পুরীতে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ২১তম সর্বভারতীয় সম্মেলন। ভারতীয় শ্রমিক সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি, সংগঠনের ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই মঞ্চে। এই ত্রিবার্ষিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা এ রাজ্যের শ্রমিক সমাজের কর্মসংস্থান সংকট, মজুরি বৈষম্য, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত নানা বিষয় তাঁদের আলোচনায় তুলে ধরেন। সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় রেখে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের শ্রমিক স্বার্থে দায়িত্ব পালনের কথা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হলো সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যেই আগামী দিনে সংগঠনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা হবে। ঐক্য, দায়িত্ব ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে শ্রমিক স্বার্থরক্ষার লড়াই আরও জোরদার করার বার্তা দিয়েই সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হরিপুরে 'শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ১৫ মার্চ বীরভূম জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা 'শ্রদ্ধা' তাদের ১৭০ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিউড়ী শহর সংলগ্ন হরিপুরডাঙ্গার ৮৩ বছর বয়স্ক শিক্ষক চণ্ডীচরণ মাজী মহাশয়কে। তিনবার ওঙ্কারধ্বনি উচ্চারণ করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সংস্থার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। শ্রীমাজীকে

মাল্য নিবেদন করেন সংস্থার সহ-সভাপতি দামোদর ঘোষাল। পূজা করেন শ্রীমাজীর কন্যা রেখা মাঝি। মানপত্র পাঠ করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। শ্রীমাজীকে অর্ঘ্য হিসেবে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন সংস্থার অনুভবী সুজাতা বিষ্ণু, জগন্নাথ পাল, শচীদানন্দ দত্ত প্রমুখ। 'শ্রদ্ধা'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। শ্রদ্ধা সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন হেমন্ত দাস। অতিথি আপ্যায়নে ছিলেন অমৃতা, পায়েল, জয়দীপ, ধনঞ্জয় ও পুনম মাজী। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন চৈতালী মিশ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। শেষে পরিবেশপ্রেমী পার্থ বিষ্ণু একটি আমগাছের চারা রোপণ করেন।

মায়াপুরে সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধন কর্মশালা

গত ১১,১২ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার মায়াপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবোধনের অখিল ভারতীয় সংযোজক রবীন্দ্র যোশী। মধ্যবঙ্গের ১৫টি জেলা থেকে জেলা সংযোজক ও কুটুম্ব মিত্র-সহ ৩৫ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে কর্মশালার উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন শ্রীযোশী।

সঙ্ঘ শতবর্ষের যোজনায় গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজের বিষয়ে আলোচনা করেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত সংযোজক সুব্রত সামন্ত। সমাপন সত্রে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণবঙ্গের পূর্বতন সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। গৌড়ীয় মঠের প্রভুদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর দুই দিনের কর্মশালার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সততা, অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন

তীর্থঙ্কর মহাবীর

সরোজ চক্রবর্তী

জৈন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে মহাবীর জয়ন্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন জৈনমতের ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। জৈন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো উৎসব মহাবীর জয়ন্তী। মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি সংসার সুখ ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা সিদ্ধার্থ এবং মাতা ছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা ত্রিশলা। কথিত যে, মহাবীরের জন্মের সময় তাঁর মাতা কোনো প্রসববেদনা অনুভব করেননি। মহাবীর যৌবনেই সমস্ত রাজকীয় সুখ, গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

জৈনদের মতে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা মুক্তিরপথ নির্মাতা জৈনমত প্রচার করেছেন। তীর্থঙ্করা সংসার দুঃখ পার হওয়ার ঘাট বা তীর্থ নির্মাণ করেছিলেন বলে তাঁরা ওই নামে পরিচিত। সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর। প্রথম বাইশজন তীর্থঙ্করের কোনো ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায় না। ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ছিলেন জৈনমতের প্রকৃত প্রবর্তক। কিন্তু এই মতকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করে প্রভাবশালী করার কৃতিত্ব শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের।

জৈনমতের শেষ প্রবর্তক মহাবীরের জন্মকালও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে বলা হয়ে থাকে যে, আনুমানিক ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈশালীর উপকণ্ঠে কুন্দগ্রাম বা কুন্দপুর বর্তমানে মজফ্ফরপুর জেলার বসার গ্রামে জ্ঞাতৃক নামক ক্ষত্রিয় রাজবংশে মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম বর্ধমান। তরুণ বয়সে যশোদা নাম্নী কুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ৩০ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১২ বছর কঠোর সাধনার পর ঋজুপালিকা নদীর তীরে এক শালগাছের নীচে তিনি কৈবল্য বা সিদ্ধিলাভ করে জিন বা জিতেন্দ্রিয় নামে বিখ্যাত হন এবং চিরতরে বস্ত্র ত্যাগ করে নির্গ্রন্থ (গ্রন্থি হীন বা সংসার বন্ধনহীন) হন। কৈবল্যের মাধ্যমে তিনি কামাদিরিপু ও সুখ-দুঃখকে জয় করেছিলেন বলে তাঁকে মহাবীর বলা হয়। যে মানুষ আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি রিপু জয় করেছেন এবং সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁকে জিন বলা হয়। জিন থেকে তাঁর শিষ্যদের জৈন বলা হয়। সংস্কৃত জিন শব্দটির অর্থ জয়ী। জিনদের আচরিত ও প্রচারিত পথের অনুগামীদের জৈন বলা হয়।

জৈনমত শ্রমণ প্রথা থেকে উদ্গত মত। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম মতগুলির মধ্যে অন্যতম। জৈনরা তাঁদের ইতিহাসে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের শিক্ষাই জৈনমতের মূল ভিত্তি। আধুনিক বিশ্বে জৈন মতাবলম্বীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও এই মত বেশ প্রভাবশালী। ভারতবর্ষ, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম ইউরোপ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জৈন মতাবলম্বীরা রয়েছেন। ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে জৈনমতের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জৈনরা মানুষের সমান অধিকারের দাবিকে তুলে ধরেন। আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জানিয়ে জৈনমত আত্মার উৎকর্ষ ও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মধ্যযুগের জৈন সন্ন্যাসীগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃতে বহু টীকা ও ভাষ্য রচনা করেন। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা খুব উৎসাহিত ছিলেন। শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চাতেও তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জৈনদের প্রতিষ্ঠিত বিহার, মন্দির ও গুহা রয়েছে। এইসব মন্দিরে বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আজও সংরক্ষিত আছে।

সিদ্ধি লাভের পর মহাবীর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি মগধ, অঙ্গ, কোশল, মিথিলা, নালন্দা, রাজগৃহ, বৈশালী-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা স্থানে মত প্রচার করে বহু নর-নারীকে জৈনমতে দীক্ষিত করেন। সমসাময়িক রাজন্যবর্গও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করতেন। ৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ৭২ বছর বয়সে রাজগৃহের কাছে পাবা নগরীতে তিনি প্রায়োপবেশনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

মহাবীর যে মত প্রচার করেছিলেন, তার মূল ছিল পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত চতুর্যাম। এই চতুর্যাম হলো— অহিংসা, সত্য, অচৌর্য অর্থাৎ চুরি না করা এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত থাকা। এই চারটি নীতির সঙ্গে মহাবীর আরও একটি নীতি যুক্ত করেন, তা হলো ব্রহ্মচর্য। এই পাঁচটি নীতি 'পঞ্চমহাব্রত' নামে পরিচিত। মহাবীরের মতে সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান এবং সত্য আচরণ ত্রিরত্ন নামে পরিচিত। এই ত্রিরত্নের সাহায্যে সিদ্ধশিলা অর্থাৎ পরম শুদ্ধ আনন্দ বা আত্মার মুক্তি লাভ সম্ভব।

জৈনরা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সুষ্ঠু ও চরম প্রকাশকেই ঐশী শক্তিরূপে গণ্য করেন। তাঁদের মতে, তীর্থঙ্করদের মধ্যেই ঐশী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা কর্মফল ও জন্মান্তরতত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, পঞ্চমহাব্রত পালন ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাই কর্ম ও জন্মান্তরের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জৈনরা সকল বস্তু, এমনকী পাথর ও ধাতুর মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, প্রাণীহত্যা মহাপাপ। অহিংসা, অপরিগ্রহ, কৃচ্ছ্রসাধন ও রিপুজয় জৈনমত অনুমোদিত সর্বোত্তম বৃত্তি।

জৈনমত হিন্দু ধর্মের মূলধারা, বিশেষত উপনিষদ ও আরণ্যকের ভাবনা থেকে তা উদ্ভূত। জৈনমতে গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে। পাশাপাশি হিন্দুরাও পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ ও মহাবীরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে থাকেন। আসলে জৈনমত সনাতন হিন্দুধর্মেরই একটি সংস্কারিত রূপ। তাই জৈনদের হিন্দু হিসেবেই গণ্য করা হয়।

অহিংসাকেই জৈনরা খুব গুরুত্ব সহকারে মেনে চলেন। জৈনমতের মূল সূত্রগুলি প্রথমে মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে তা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। জৈনশ্রমন ভদ্রবাহু রচিত কল্পসূত্রকে জৈনদের আদি শাস্ত্রগ্রন্থ বলা যেতে পারে। চোদ্দটি পর্বে রচিত এই গ্রন্থ থেকে মহাবীরের বাণী সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত প্রথম জৈন সংগীতিতে জৈন শাস্ত্রকে চোদ্দটি পর্বের পরিবর্তে বারোটি অঙ্গে সংকলিত করা হয়। এগুলিকে দ্বাদশ অঙ্গ বলা হয়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুজরাটের বলভীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জৈন সংগীতিতে আবার নতুনভাবে জৈনগ্রন্থ সংকলন করা হয়। বর্তমানে ওই সংকলন জৈন আগম বা জৈন সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। জৈন সিদ্ধান্ত আবার অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র— এই নামে চারটি ভাগে বিভক্ত। এছাড়া চতুর্বেদ, পরিশিষ্টপার্বণ প্রভৃতি জৈনমত গ্রন্থ থেকে এই ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। এইসব গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। জৈন দার্শনিকদের মধ্যে স্থূলভদ্র, ভদ্রবাহু, হেমচন্দ্র, সিদ্ধান্ত, হরিভদ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভদ্রবাহু'র নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে জৈনমতের প্রচার ব্যাপকভাবে হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে জৈনরা মহাবীরের অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে মেনে চলেন। তাঁরা কোনো গ্রন্থি বা বস্ত্র ধারণ করেন না। এই জন্য তাঁদের দিগম্বর বলা হয়। অন্যদিকে স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে যে জৈনরা উত্তর ভারতে থাকেন এবং শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন, তাঁদের শ্বেতাম্বর বলা হয়।

জৈন মতানুশীলনে নিরামিষ আহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ জৈন দুগ্ধজাত ও নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকেন। কারণ অহিংসা জৈনমতের প্রধান ও সর্বাধিক পরিচিত বৈশিষ্ট্য। কোনো রকম আবেগের তাড়নায় কোনো প্রাণীকে হত্যা করাকেই জৈনমতে হিংসা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকাই জৈনমতে অহিংসা নামে পরিচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে কীটপতঙ্গের ক্ষতি করা জৈন জীবনানুশীলনে নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, কীটপতঙ্গ মারার বদলে থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জৈনমতে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করা ও নির্দয় হওয়াকে হিংসার চেয়েও গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হয়। মহাবীর সৃষ্ট জৈনমতের আরও একটি আদর্শ হলো অনেকান্ততত্ত্ব। জৈনদের কাছে অনেকান্ততত্ত্ব হলো মুক্তমনস্ক হওয়া। এই ধারণাটি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অহিংসার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করে।

মহাবীর জয়ন্তী সমগ্র দেশে পালিত হয়। তবে ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে বেশ ধুমধাম সহকারে পালন করা হয়। বিহারের ভাগলপুর, নালন্দা জেলায়; গুজরাটের গিরনার, জুনাগড়, পালিতানা; রাজস্থানের মাউন্ট আবু; কলকাতার মানিকতলায় পরেশনাথ মন্দির-সহ বিভিন্ন স্থানে মহাবীরজয়ন্তী ঘটা করে পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে মহাবীরের বাণী পাঠ, জীবনী পাঠ, পূজা, প্রার্থনা, ভক্তিমূলক গান- সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জৈন মন্দিরগুলিকে পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। কোথাও কোথাও শোভাযাত্রাও বের হয়।
এই দিন জৈনরা সততা, অহিংসা ও প্রেমের ব্রত নেন। পাশাপাশি সমগ্র জীবকুলকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আত্মোন্নতিরও শপথ গ্রহণ করেন। □

পাতাললোকেও শ্রীহনুমান দুষ্টের দমন করেন

গোপাল চক্রবর্তী

পবননন্দন শ্রীহনুমান, বীর শ্রীহনুমান, বজ্রাঙ্গবলী, সংকট মোচন, রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণকাহিনিতে নানারূপে নানা ভূমিকায় আমরা শ্রীহনুমানকে দেখি। তবে সংকটমোচন শ্রীহনুমানের পাতাল-লঙ্কা বিজয়, মহীরাবণ, অহিরাবণ বধ, বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রাণ রক্ষা করা শ্রীহনুমান চরিত্রকে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। লঙ্কানগরী তখন বানর সেনার দ্বারা অবরুদ্ধ। কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ-সহ লঙ্কার বীরদের পতন হয়েছে। একমাত্র জীবিত লঙ্কেশ্বর রাবণ। বানর সেনাদের মধ্যে তখন উল্লাস। রাম-লক্ষ্মণও তখন জয় সম্পর্কে নিশ্চিত। এই সময়ে মিত্র বিভীষণের স্মরণ হলো, রাবণের এক মহাবলী পুত্র এখনো জীবিত। সেই মহীরাবণ বীরত্বে পিতার সমতুল্য, মায়াবী। রাবণ তাকে পাতালপুরীর অধিকার দিয়েছে। ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করে সে যেকোনো অঘটন ঘটাতে পারে। এমনকী মায়াজাল রচনা করে সে রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা কিংবা অপহরণও করতে পারে। মহীরাবণের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভীষণ পক্ষীরূপ ধারণ করে রাবণের প্রাসাদে গিয়ে পিতা-পুত্রের গোপন মন্ত্রণা শুনে এসেছেন। শিবিরে ফিরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সহ সকল বানর-বীরদের সঙ্গে আলোচনা করে চরম সতর্কতা অবলম্বন করলেন। বানর সেনাদের বললেন—

---এই মায়াবী মহীরাবণের পাতাল প্রাসাদে মহামায়া বন্দি আছেন। সে যা ভাবে তাই করতে পারে। এই মহীরাবণের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান। সেই দুষ্টরাক্ষস এখন লঙ্কায়, তাই আজকের রাত সবাইকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

সকল বানরবীর বিভীষণের সঙ্গে সহমত হয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। বীর হনুমান আপন পুচ্ছের বিস্তার ঘটিয়ে এক বিচিত্র গড় নির্মাণ করলেন। নিজে দ্বার রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে অভ্যন্তরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এবং তাঁদের নিরাপত্তার জন্য বানর বীরদের নিয়োজিত করা হলো। সদা সতর্ক বিভীষণ শ্রীহনুমানকে সতর্ক করলেন যে মহীরাবণ বিভিন্ন রূপ ধরে গড়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে, এমনকী সে হনুমানের পিতা পবন দেবের রূপ ধরেও আসতে পারে। কোনো অবস্থাতেই যেন তাকে গড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া না হয়। সতর্ক হনুমান, আর বিভীষণ শ্রীহনুমান রচিত সেই কৃত্রিম দুর্গের চারপাশে অনবরত সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। শ্রীহনুমানের অনুরোধে শ্রীরাম দুর্গের উপরিভাগে সুদর্শন চক্রকে স্থাপন করেছেন। মায়াবী মহীরাবণ তখন সকলের অলক্ষ্যে বানর শিবিরে উপস্থিত হয়েছে। শিবিরের সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখে সহজে কার্যসিদ্ধি হবে না অনুমান করে মায়ার আশ্রয় নিয়ে শ্রীরামের পিতা দশরথের রূপ ধারণ করে সেই দুর্গদ্বারে উপস্থিত হলো এবং পিতার পরিচয় দিয়ে পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। সতর্ক শ্রীহনুমান তাকে বিভীষণ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। বিভীষণের নাম শুনে মায়াবী তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল।

বিভীষণ এসে এই কথা শুনে শ্রীহনুমানকে আবার সতর্ক করে গড়ের চারপাশ ঘুরে দেখতে গেলেন। বিভীষণ চলে যেতেই মহীরাবণ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের রূপ ধারণ করে হনুমানের কাছে এসে পরিচয় দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চায়, শ্রীহনুমান তাকেও বিভীষণের জন্য অপেক্ষা করতে বললে সে পালিয়ে যায়। এরপর মহীরাবণ শ্রীরামের মাতা কৌশল্যা এবং শ্বশুর জনকের রূপ ধারণ করে শ্রীহনুমানের কাছে আসে এবং বিভীষণ এসে পড়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে বারবার ব্যর্থ হয়ে মহীরাবণ এবার বিভীষণের রূপ ধরে সেই দুর্গদ্বারে শ্রীহনুমানের কাছে আসে। এবার শ্রীহনুমান বিভ্রান্ত হলেন। বিভীষণরূপী মহীরাবণ হনুমানকৃত গড়ের অভ্যন্তরের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য গড়ে প্রবেশ করল। শ্রীহনুমান বুঝতেই পারলেন না যে তাঁকে বিভ্রান্ত করে মহীরাবণ গড়ে প্রবেশ করেছে। ভুল ভাঙল অনতিবিলম্বে বিভীষণ গড় প্রদক্ষিণ শেষ করে শ্রীহনুমানের কাছে ফিরে এলেন। বিভীষণকে আবার সামনে উপস্থিত দেখে শ্রীহনুমান বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—

—আপনি এইমাত্র প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গড়ে প্রবেশ করলেন, আবার এখন দেখছি আপনি আমার সামনে। আসল বিভীষণ কে?

বিভীষণ বুঝতে পারলেন যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাঁরই রূপ ধরে মহীরাবণ গড়ে প্রবেশ করেছে। হনুমানকে এই ইঙ্গিত দিয়ে বিভীষণ

অতি দ্রুত গড়ে প্রবেশ করলেন ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। মায়াবলে সকলকে অচৈতন্য করে মহীরাবণ সুড়ঙ্গ পথে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে পাতালে চলে গেছে।

এদিকে হনুমান এবার বিভীষণকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন হয়তো বিভীষণের ষড়যন্ত্র। কিছু বাক্‌বিতণ্ডার পর হনুমানের ভুল ভাঙে, তখন দুজনে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন সব বানরসেনা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যথা স্থানে নেই, সেখানে এক বিরাট সুড়ঙ্গ। তখন তাঁদের বুঝতে বাকি রইলো না যে মহীরাবণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে হরণ করেছে। শ্রীহনুমান আর বিভীষণের যত্নে একে একে বানরবীরগণ চৈতন্য লাভ করে। সুগ্রীব অঙ্গদ, নল, নীল প্রমুখ যোদ্ধা চৈতন্য লাভ করে সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে শোকে রোদন শুরু করে। প্রাজ্ঞ জাম্বুবান সকলের উদ্দেশে বলেন—

—এই ঘোর বিপদে রোদন কর্তব্য নয়। এই বিপত্তির সময়ে কেউ অস্থির হয়ো না। প্রভু শ্রীরাম, লক্ষ্মণকে বিনাশ করতে পারে এমন শক্তি ত্রিভুবনে কারও নেই। রাজা সুগ্রীব। তুমি আমার মন্ত্রণা শোনো। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে তুমি মারুতিকে প্রেরণ কর। ত্রিজগতে মারুতির অগম্য কোনো স্থান নেই। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন মারুতি অবশ্যই তাঁদের সন্ধান পাবে।

জাম্বুবানের বাক্য সমস্ত বানরবীর একবাক্যে সমর্থন করলো। রাজা সুগ্রীব বলল—

—হে পবননন্দন শ্রীহনুমান! তুমি হেলায় সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতামাতার সন্ধান করেছ। তুমি শ্রীরামের প্রধান ভক্ত একথা সর্বজনবিদিত তোমার বুদ্ধিভ্রমে শ্রীরাম লক্ষ্মণ অপহৃত হয়েছেন। তুমিই তাঁদের অন্বেষণ কর।

সুগ্রীবের বচনে লজ্জায় অভিমানে মারুতির চোখ দু'টি ছল ছল করে উঠল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—

—প্রভুর অন্বেষণে আমি অবশ্যই যাব। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন খুঁজে আমি তাঁদের নিয়ে আসব। আর যদি খুঁজে না পাই তবে এই জলধির জলে আত্ম বিসর্জন দেব। যতক্ষণ আমি তাঁদের সন্ধান নিয়ে না আসি ততক্ষণ তোমরা এখানে একত্রিত হয়ে থাক।

সুগ্রীব ও জাম্বুবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীহনুমান যে সুড়ঙ্গ পথে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে অপহরণ করা হয়েছে বলে সন্দেহ, সেই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে। দীর্ঘ সময়ে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে এক সময়ে শ্রীহনুমান পাতালপুরীতে প্রবেশ করেন। পাতালপুরীর মধ্যাকাশে তখন সূর্যের প্রকাশ। দৃষ্টিনন্দন বিচিত্র হর্ম্যরাজি, প্রথমেই বলীরাজার প্রাসাদ। তার পাশ দিয়ে পাতালগঙ্গা ভোগবতী প্রবাহিতা। স্থানে স্থানে মুনিঋষিদের সমাবেশ। বিস্তৃত রাজপথে চলেছে যক্ষ- যক্ষিনী, নাগ-নাগিনীর দল। এই পুরীতে জরা-মৃত্যু নেই, নেই রোগ- শোক। শ্রীহনুমান ছদ্মবেশে ঘুরছেন কত তপোবন, কত তীর্থস্থান, অতিথি নিবাস কোথাও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে পৌঁছে গেলেন পাতাল-লঙ্কায় মহীরাবণের পুরীতে। এই পুরী অমরাবতী তুল্য। অতিক্ষুদ্র বানরের রূপধারণ করে শ্রীহনুমান এই পুরীতে প্রবেশ করলেন। সুবর্ণনির্মিত বিচিত্র প্রাসাদ, পাষাণ রচিত কত দীঘি, সরোবর। পুণ্যার্থী, স্নানার্থী, বিদ্যার্থীর মেলা, কিন্তু শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোথায়? শ্রীহনুমান তখন সেই ক্ষুদ্র বানরের রূপে এক বৃক্ষে আরোহণ করে বসে রইলেন। সেখান থেকে শ্রীহনুমান সব দেখছেন সব শুনছেন। আর শ্রীহনুমানকেও সবাই দেখছেন, কারণ ইতিপূর্বে এই পাতালপুরীতে এহেন বানর কেউ দেখেনি। সবাই দেখছে আর ভাবছে, এই মর্কট কোথা থেকে এল? এইবার শ্রীহনুমান নজরে এল এক অতিবৃদ্ধার। তার শনের মতো চুল, কুচকে যাওয়া চামড়া কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রখর। আর স্মৃতি অম্লান। এই মর্কটকে দেখে বৃদ্ধা চমৎকৃত হলো, তার এক পূর্বকথা স্মরণ হলো। বৃদ্ধা তখন এক প্রতিবেশিনীকে ডেকে সেই গোপন কথা বলতে শুরু করল।

—ওলো শোন্, আমি আজ এক বিপদের আভাস পাচ্ছি। সে অনেকদিন আগের কথা। আমাদের রাজা মহীরাবণ অমর হওয়ার জন্য বহুদিন মহামায়ার কঠোর তপস্যা করল। অবশেষে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী মহামায়া জাগ্রত হয়ে মহীকে বর দিতে চাইলেন। রাজা মহীরাবণ তখন দেবী মহামায়ার কাছে অমরত্বের বর প্রার্থনা করলেন। দেবী বললেন অমরত্ব ছাড়া অন্য কোনো বর চাও। চতুর মহীরাবণ তখন মহামায়াকে বললেন— দেবি, আমাকে এই বর দাও যেন দেবতা গন্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ, শ্বাপদ কিংবা সর্পের হাতে আমার মৃত্যু না হয়।

দেবী তাকে সেই বর দিলেন। বর দিয়ে দেবী অন্তর্ধান করলেন। মহীরাবণ ভাবল বাকি রইল নর আর বানর। এই দুই আমার ভক্ষ্য, ওরা আমার কী করবে? দেবী কিন্তু অন্তর্ধানের আগে দৈববাণীতে বলে গিয়েছিলেন যে এই নর-বানরের হাতে মহীরাজা সবংশে সংহার হবে। ক্রমে বেলা বাড়ছে পুরনারীরা দলে দলে কলসী কাঁখে সরোবরে জল নিতে আসছে। সবার চোখে মুখে কৌতূহল। এক পুরবাসিনী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল— দাইমা! রাজপ্রাসাদে আজ কীসের উৎসব? বাদ্য বাজছে, মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, বহুলোকের আনাগোনা?

বৃদ্ধা বলল—

—শোন্, কথাটা এখন পাঁচকান করিস না। আজ রাজার মন্দিরে মহামায়ার কাছে নরবলি হবে। রাজা কোথা থেকে অনিন্দ্যসুন্দর দুই যুবাকে ধরে এনেছে। আর দু'চার দণ্ড পরে তাদের বলি হবে। রাজবাড়ির গোপন কথা তোদের বলে ফেললাম। গোপন রাখিস কথাটা। রাজা দুই নরকে ধরে এনেছে, আবার এক বানর কোথা থেকে এসে জুটেছে। আগের কথা স্মরণ করে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।

বৃক্ষের উপর বসে শ্রীহনুমান সব কথা শুনলেন। রাম-লক্ষ্মণ যে রাজপ্রাসাদের কোনো গোপন কক্ষে বন্দি আছে তাতে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না। কালবিলম্ব না করে সকলের অলক্ষ্যে শ্রীহনুমান প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরলেন শ্রীহনুমান, কিন্তু কোথাও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সন্ধান পেলেন না। হঠাৎ তাঁর নজরে এল

এক প্রাসাদ ঘিরে অস্ত্রধারী নিশাচরদের সমাবেশ। শ্রীহনুমানের কৌতূহল হলো, এই ক্ষুদ্র প্রাসাদ ঘিরে এত নিরাপত্তা কেন? মক্ষিকার রূপ ধারণ করে হনুমান প্রবেশ করলেন সেই প্রাসাদে। এই কক্ষ, সেই কক্ষ ঘুরে এক কক্ষে দেখতে পেলেন নিদ্রিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে। মায়ার প্রভাবে এখনো তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। মক্ষিকারূপে শ্রীহনুমান অলিন্দ পথে কক্ষে প্রবেশ করে আপন শরীর ধারণ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে জাগ্রত করলেন। নিদ্রাভঙ্গ হলে শ্রীরাম শ্রীহনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন—

—মিত্র সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণ কোথায়?

শ্রীহনুমান বললেন—

—প্রভু! মহাবিপদ ঘটে গেছে, আমার পুচ্ছনির্মিত গড় থেকে কৌশলে মহীরাবণ আপনাদের হরণ করে পাতালে নিয়ে এসেছে। আমি তারই নির্মিত সুড়ঙ্গপথে পাতালপুরীতে এসে অনেক অনুসন্ধানের পর আপনাদের সন্ধান পেয়েছি।

এই সময়ে বাইরে দামামা বাজিয়ে ঘোষণা হলো— 'আজ মহামায়ার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে, প্রচুর ছাগ ও মহিষ বলি হবে, সেই সঙ্গে দুই যুবা নর।' এই ঘোষণা শুনে সন্ত্রস্ত শ্রীরাম শ্রীহনুমানকে বললেন—

—পবননন্দন! আমরা মহাবিপদে আছি, সৈন্য নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, পাতালের বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো কীভাবে?

শ্রীহনুমান তখন শ্রীরামচন্দ্রের সামনে জোড় হাত করে বললেন—

---প্রভু, আপনার শ্রীচরণের দাস ত্রিভুবনে খ্যাত। অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, বৃক্ষ ও প্রস্তর দিয়ে আজ শত্রু নিপাত করব। রাবণ রাজার বংশের যে যেখানে আছে আপনার কৃপায় একে একে সবাইকে শমন ভবনে পাঠাব। রাক্ষস বধের জন্য এবার আপনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার মহিমার কথা এই দুষ্ট জানে না। মৃত্যুকে আহ্বান করার জন্য দুষ্ট মহীরাবণ আপনাকে এখানে এনেছে। এই প্রাসাদের মন্দিরে দেবী মহামায়া অবস্থিতা, আমি গোপনে সেই দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। যদি মহামায়া এই দুষ্ট রাক্ষসের হিত করতে চায় তবে মন্দির-সহ তাঁকে সমুদ্রে ডোবাব। আমি মহামায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসছি। আমার কালবিলম্ব হবে না। আপনারা ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারুতি অবিলম্বে মহামায়ার মন্দিরে যান। মক্ষিকারূপ হনুমান কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। মক্ষিকারূপে শ্রীহনুমান মন্দিরে প্রবেশ করে মহামায়ার কানে কানে বলতে থাকেন—

—হে জগৎজননী! তোমার কাছে বলি দেওয়ার জন্য মহীরাবণ শ্রীরাম-লক্ষণকে হরণ করে এনেছে। আজ দ্বিপ্রহরে তাদের বলি হবে। তুমি কি মহীরাবণকে এই আজ্ঞা দিয়েছ? যদি দিয়ে থাক তবে তোমার সামনে আমি সবংশে মহীরাবণকে বধ করব, আর তোমাকে মন্দির-সহ সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করব।

শ্রীহনুমানের বচন শুনে স্মিতহাস্যে দেবী বললেন—

শ্রীরামের আগমনে এই পাতালপুরী পবিত্র হয়েছে। মহীরাবণ মহাপাপী, সর্বদা দেব-দ্বিজ-ধর্ম হিংসা করে এই মায়াবী রাক্ষসের উৎপীড়নে ত্রিভুবন অতিষ্ঠ। এই দুরাত্মা রাক্ষসদের সংহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। নির্বোধ মহীরাবণ নিজের বিনাশের জন্য সাক্ষাৎ শমনকে আহ্বান করেছে। শুদ্ধাত্মা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বলির নিমিত্ত এই মন্দিরে আনয়ন করা হবে। তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে গোপনে এই ক'টি কথা বলবে। আমার সম্মুখে বলির আগে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে এনে প্রণাম করতে বলবে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন বলে যে তারা রাজপুত্র, প্রণাম করতে জানে না। শ্রীরাম মহীরাবণকে বলবে কী করে প্রণাম করতে হয় দেখিয়ে দেবার জন্য। মহীরাবণ অষ্টাঙ্গে হেঁটমুণ্ডে প্রণাম করবে। তখন তুমি এই খড়্গ নিয়ে মহীরাবণের ধর-মুণ্ড আলাদা করবে। মহামায়ার এই বাক্য শোনার পর শ্রীহনুমান আবার সংগোপনে শ্রীরাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে দেবীর এই বার্তা জ্ঞাপন করেন।

যথাসময়ে অনুচরগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে স্নান করিয়ে মহামায়ার মন্দিরে নিয়ে আসে। মহীরাবণ পূজা শেষ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে প্রণাম করতে বলে। উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলেন—

—আমরা রাজপুত্র, প্রণাম করতে জানি না। তুমি দেখিয়ে দিলে করতে পারি।

তখন মহীরাবণ অষ্টাঙ্গে হেঁটমুণ্ডে মহামায়ার সামনে প্রণাম করে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহনুমান নিজমূর্তি ধারণ করে খড়্গ দ্বারা মহীরাবণের শিরশ্ছেদ করেন। দেবলোকে জয়ধ্বনি ওঠে। মহীর অনুচরেরা ত্রাসে পলায়ন করে অন্তঃপুরে এই দুঃসংবাদ দেয়। সংবাদ গেল মহীরাবণের স্ত্রীর কাছে। অসুরনন্দিনী মহা তেজবতী দিব্য তির-ধনুক নিয়ে নর- বানরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলল। দেবী মহামায়ার প্রতিও রানি ক্ষুব্ধ। যে মহীরাবণ এতদিন ভক্তিভরে দেবীর পূজা করে এসেছে আজ দেবী সেই ভক্ত মহীরাবণকে বলি রূপে গ্রহণ করলেন। সেই দেবীরও আজ বিসর্জন দেবে অসুরনন্দিনী মহীরাবণের রানি। মন্দিরে শ্রীহনুমানকে দেখে তীক্ষ্ণবাণ ছুঁড়তে থাকে রানি, শ্রীহনুমান এক বৃক্ষ উৎপাটিত করে সেই বাণ প্রতিহত করেন ততক্ষণে পাতালপুরীর রাক্ষসবাহিনী এসে রানির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়। শ্রীহনুমান বৃক্ষ ও পাথর নিক্ষেপ করে সেই সেনাদের বিধ্বস্ত করেন। রানি দশমাসের অন্তঃসত্ত্বা, তথাপি শ্রীহনুমান এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উপর অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করে চলেছে। শ্রীহনুমান বৃক্ষ দ্বারা সেই তির প্রতিহত করতে করতে একসময়ে রানির উদরে প্রচণ্ড পদাঘাত করেন। সেই পদাঘাতে রানির গর্ভপাত হয়। মাতৃউদর থেকে বেরিয়ে মহীরাবণের পুত্র হনুমানের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করে।

শ্রীহনুমান কৌশলে তার পা দু'টি ধরে এক বিশাল প্রস্তর খণ্ডে ছুঁড়ে মারে আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। রানিকেও শ্রীহনুমান যমালয়ে পাঠায়। এবার দেবী মহামায়াকে মুক্ত করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহনুমান সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আবার বানর শিবিরে ফিরে আসেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ শ্রীহনুমান এবং সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্বুবান, নল, নীল প্রভৃতি বীরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। বানর শিবিরে শ্রীরামের সঙ্গে সঙ্গে হনুমানের জয়ধ্বনিতে লঙ্কা প্রকম্পিত হয়। মহীরাবণের মৃত্যুসংবাদে রাবণ প্রমাদ গোনে। □

ফঃ ৫

আগামী বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশ পরম বৈভবশালী হবে— ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হলো গত ১৩ থেকে ১৫ মার্চ হরিয়াণা রাজ্যের সমালখায়। সভায় সারা দেশ থেকে ১৪৩৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে সভায় প্রতিবেদন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণকারী ১২৮৫ জন কার্যকর্তা উপস্থিতিতে শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতি শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্ঘের কার্যক্রমের বিস্তারও অব্যাহত থাকে। বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের শতবর্ষ পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে অসংখ্য উৎসব ও কর্মসূচি শুরু হয়। শতবর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি সর্বত্র অত্যন্ত সফল হয়েছে, যার মূল কারণ ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম। সমাজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই কর্মসূচিগুলিকে গ্রহণ করেছে এবং দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষ আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে কর্মসূচি আয়োজনের ফলে সংগঠন যেমন উপকৃত হয়েছে, তেমনই সমাজের সুদূরতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। গৃহ সম্পর্ক কর্মসূচির মাধ্যমে সঙ্ঘ প্রত্যেক পরিবার পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে, আর সদ্ভাবনা বৈঠক এবং প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমাজে ইতিবাচক চিন্তা ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলেছে। সঙ্ঘের যাত্রাপথ ও কাজ সম্পর্কে সমাজে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতীয় জীবনে সঙ্ঘের ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যাশাও বেড়েছে। পঞ্চ পরিবর্তনের বিষয়গুলি সর্বত্র স্বাগত ও আলোচিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা সমাজের বিভিন্ন স্তরে কার্যকর রূপ নিতে শুরু করেছে। সঙ্ঘ সম্পর্কে বহু মানুষ গ্রন্থ রচনা করেছেন, নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এবং চলচ্চিত্রও নির্মাণ হয়েছে। ভারত সরকারও সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। সমাজের শুভেচ্ছা ও সমর্থনের জন্য আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শতবর্ষের বিশেষ কর্মসূচির পাশাপাশি নিয়মিত কার্যক্রমও যথারীতি চলেছে। এই প্রতিবেদনে সেই সমস্ত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত কর্মসূচির পূর্ণ বিবরণ সীমিত পরিসরে দেওয়া সম্ভব না হলেও এক ঝলক উপস্থাপন করা হয়েছে।

গৃহ সম্পর্ক অভিযান সারা দেশে এখন পর্যন্ত ৪৬টি প্রান্তে ৩৮৯৪৬৫টি গ্রামে ৩১১৪৩টি বস্তিতে ১০,০২,১২,১৬২ পরিবার/ গৃহে যোগাযোগ করা হয়েছে।

হিন্দু সম্মেলনের পরিসংখ্যান এখন পর্যন্ত ৪৬টি প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত। অন্যান্য প্রান্তে এখনও সম্মেলন চলমান। গ্রামীণ মণ্ডলে ২৩১৪৩, শহরীয় বসতি সম্মেলন ১৩৯০৫টি হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গ : কলকাতা মহানগরে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বেহালার কলকাতা ব্লাইন্ড স্কুলে একটি 'পরিবেশ পাঠশালা' আয়োজন করা হয়। এখানে প্রকৃতি এবং আমাদের দায়িত্ব নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত অধিবেশনে স্পর্শ, ঘ্রাণ ও শব্দভিত্তিক মৌখিক সংবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে শিক্ষার প্রক্রিয়া সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। 'ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন গেম' এবং 'ইন্টারঅ্যাকটিভ কুইজ' ছিল প্রধান আকর্ষণ। আংশিক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সহপাঠীদের সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের কম্পোস্ট, বায়ো-এনজাইম এবং ইকো-ব্রিক সম্পর্কে পরিচিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে পুনর্ব্যবহৃত কাগজ দিয়ে তৈরি পেন্সিল বিতরণ করা হয়। মোট ৮৯ জন শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে।

মধ্যবঙ্গ : গত তিন বছর ধরে দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা ও রায়পুর ব্লকে ১৩টি শিশু সংস্কার কেন্দ্র এবং ১টি পাঠদান কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামের মহিলারা নিঃস্বার্থভাবে নিজ নিজ গ্রামে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার উদ্যোগ পরিচালনা করছেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রামের শিশুরা গান, যোগাসন, খেলাধুলা, নৃত্য এবং বন্দে মাতরম্-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে ৮২ জন অভিভাবক এবং ৩৭ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গ : কোচবিহার জেলায় তোর্ষা, কালজানি ও মানসাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নদীর তীরকে পলিথিনমুক্ত করা এবং একটি সবুজ বনাঞ্চল তৈরি করার উদ্দেশ্যে ১৩৫০০টি দেশীয় গাছ রোপণ করা হয় এবং ৫টি ঘন মিনি-ফরেস্ট গড়ে তোলা হয়। মানুষের মনে পরিবেশের প্রতি আবেগ ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে বৃক্ষরোপণ বৃক্ষপূজনের প্রথা চালু করা হয়। গাছগুলোর পরিচর্যা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য 'ট্রি অ্যাম্বুলেন্স' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

শ্রীহোসবলে জানান, গত এক বছরে সংগঠনের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। সঙ্ঘের শাখার প্রায় ছয় হাজার বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮৮০০০ অতিক্রম করেছে। শাখা স্থানের সংখ্যাও ৫৫০০০-এর বেশি হয়েছে। পাশাপাশি সাপ্তাহিক মিলন ও মণ্ডলীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, আন্দামান, অরুণাচল প্রদেশ, লেহ এবং দূরবর্তী জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শাখা শুরু হওয়ার মাধ্যমে সঙ্ঘের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে। এই সাংগঠনিক বৃদ্ধি সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সাংগঠনিক বৃদ্ধি সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আন্দামানে নয়টি দ্বীপ থেকে ১৩ হাজারের বেশি মানুষ হিন্দু সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে পুজনীয় সরসঙ্ঘচালক উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে কম জনঘনত্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশে ২১টি স্বধর্ম সম্মেলনে ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, সংগঠনের বিস্তারের পাশাপাশি সমাজের গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সঙ্ঘ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর ধারণার মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব কেবল একটি ভাবনা নয়, বরং এটি একটি জীবনপদ্ধতি; এর মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ ও গুণগত মানের বিকাশ হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে সমাজের ইতিবাচক ও সদিচ্ছাপূর্ণ শক্তিগুলিকে একত্রিত করা এবং 'সৎশক্তি'-কে জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

সরকার্যবাহজী বলেন, জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন সমাজকে নষ্ট করে। মহান ব্যক্তিত্বদের কাজ ও অবদানকে গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁদের প্রেরণায় ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রেক্ষিতে নবম গুরু তেগবাহাদুরজীর ৩৫০তম বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ২০০০-এর বেশি কর্মসূচি আয়োজন করেন, যাতে ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তিও উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। তিনি আরও জানান, আগামী বছরে সন্ত শিরোমণি রবিদাসজী মহারাজের ৬৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আগামী প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কে তথ্য দিয়ে দত্তাত্রেয়জী বলেন, মোট ৯৬টি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হবে, যার মধ্যে ১১টি ক্ষেত্রে এবং একটি নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও জানান, প্রতিনিধি সভায় গোসেবা ও গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নাগরিকদের নিজেদের ছাদে সবজি চাষ এবং দেশীয় গোরুর গোবর থেকে প্রস্তুত সার ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে, যাতে প্রত্যেকে গোসেবা ও মজবুত গ্রামীণ উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখতে হবে। এছাড়াও পলিথিন ব্যবহারের পরিমাণ কমানো এবং জল সংরক্ষণে গুরুত্ব দিয়ে 'সবুজ গৃহ' নির্মাণের জন্য মানুষকে সংকল্প নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আগামী বছরে সংগঠনের কাঠামোগত বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতিনিধিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বর্তমান 'প্রান্ত'-এর পরিবর্তে 'সম্ভাগ' নামে ছোটো একক গঠন করা যেতে পারে। এটি বাস্তবায়িত হলে বর্তমানে ৪৬টি প্রান্তের পরিবর্তে ৮০টিও বেশি সম্ভাগ গঠিত হবে।

সরকার্যবাহজী বলেন, সমাজে জাতিভিত্তিক বিভাজন দূর করতে এবং নির্বাচনের সময় ভোটারদের জাতিভিত্তিক মূল্যায়ন বন্ধ করতে গণমাধ্যমকেও এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বার্থে সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বলেন, সঙ্ঘ বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান করে।

তিনি বলেন, ডাঃ হেডগেওয়ার কোনো সম্প্রদায় বা উপাসনা পদ্ধতির বিরোধিতা করার জন্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেননি। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীও বলেছিলেন, সকল মানুষের পূর্বপুরুষ এক এবং উপাসনা পদ্ধতির ভিন্নতা বিভেদ সৃষ্টি করে না। যদিও তখন 'ডিএনএ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। অর্থ একই ছিল। তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসও বলেছেন, যারা ভারতকে মাতৃভূমি ও রাষ্ট্র হিসেবে মানেন এবং ভারতীয়ত্বের চেতনায় জীবনযাপন করেন, তারাই হিন্দু। তিনি আরও যোগ করেন, সঙ্ঘে সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত এবং যারা

সমাজের জন্য ভালো কাজ করেন, তাদের সবাইকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে গণ্য করা হয়।

সারা দেশের সমাজে আন্দামান ও অরুণাচল-সহ সঙ্ঘের প্রতি আগ্রহ স্পষ্ট। আন্দামানে সরসঙ্ঘচালকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে নয়টি প্রধান দ্বীপ থেকে ১৩ হাজারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে কম জনঘনত্বের অরুণাচল প্রদেশে ২১টি স্বধর্ম সম্মেলনে ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

জাতি ও সম্প্রদায়ের বিভাজন অতিক্রম করে মহান ব্যক্তিত্বদের সম্মান ও অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে নবম গুরু তেগবাহাদুরজীর ৩৫০তম বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশে ২০০০-এর বেশি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়, যাতে ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সন্ত শিরোমণি রবিদাসজীর ৬৫০তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষ্যে সরকার্যবাহজীর বক্তব্যে প্রতিনিধি সভায় সম্মতি গ্রহণ করা হয় যে আগামী এক বছর সারা দেশে সন্ত শিরোমণি রবিদাসজীর ৬৫০তম আবির্ভাব বর্ষ পালন করা হবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন—

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সন্ত শিরোমণি রবিদাসজীর ৬৫০তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়েছে। ভারতের মহান সন্ত-পরম্পরা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অনন্য দান। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই মহান সন্ত-পরম্পরা যেমন সমাজে ঈশ্বরোপাসনা ও ভক্তিভাবের জাগরণ ঘটিয়েছে, তেমনই সামাজিক কুপ্রথা ও বৈষম্য দূর করে সমন্বিত সমাজকে সুদৃঢ় করার প্রয়াসও চালিয়েছে। পাশাপাশি, বিদেশি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এই মহান সন্ত-পরম্পরায় সন্ত রবিদাসজীর বিশেষ স্থান রয়েছে। তাঁর কর্মনিষ্ঠ জীবন ও কার্যকলাপ আমাদের সকলের জন্য প্রেরণার উৎস। গার্হস্থ্য জীবনে থেকেও তিনি জাগতিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সাধু-সন্তদের প্রতি শ্রদ্ধা, দরিদ্র ও অবহেলিতদের প্রতি সেবাকে স্বাভাবিক স্বভাব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যা গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিজের জীবনাদর্শের মাধ্যমে সমাজে শ্রমের মর্যাদা এবং শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও স্বচ্ছ আচরণের গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

সন্ত রবিদাসজী ভক্তিধারার এক মহান সাধক ছিলেন, যিনি সমাজে এক নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন। জন্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ বিভাজনকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে আচরণকেই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসেবে স্থাপন করেন। সমাজকে কুপ্রথা ও অনর্থক রীতিনীতি থেকে মুক্ত করা, অচল প্রথা পরিত্যাগ করা এবং সময়োপযোগী সামাজিক পরিবর্তন গ্রহণে মানসিকতা গড়ে তুলতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। তাঁর ভাবধারার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবে তাঁর ৪১টি বাণী 'শব্দ' রূপে সংকলিত হয়েছে।

সাধারণ পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত সন্ত রবিদাসজী ঈশ্বরভক্তি, সেবাভাব এবং সমাজের প্রতি নিষ্কলুষ প্রেমের কারণে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী-সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁর মহত্ত্ব স্বীকৃত হয়। কাশীর রাজা, মেবার রাজ্যের ঝালি রানি এবং মীরাবাঈয়ের মতো রাজপরিবারের সদস্যরাও তাঁকে তাঁদের গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। গুরু ও শিষ্য হিসেবে সন্ত রবিদাসজী ও মীরাবাঈয়ের সম্পর্ক নির্গুণ ও সগুণ ভক্তিধারার এক অপূর্ব সমন্বয়, যা জাতিভেদ মান্যকারীদের জন্য এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। মুসলমান আক্রমণকারীদের সন্ত্রাসের সেই কঠিন সময়ে ভক্তির নির্মল ধারাকে অব্যাহত রেখে সন্ত রবিদাসজী ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন এবং মানুষকে ধর্মাচরণের আহ্বান জানান। সদগুরু সন্ত শ্রীরবিদাসজীকে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান বানানোর বহু চেষ্টা করা হলেও তাঁর ভক্তি ও আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রভাবিত হয়ে যারা তাকে ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছিল, তারা শেষে তাঁর অনুসারী হয়ে ওঠে।

বর্তমান সময়ে যখন বিভিন্ন বিভাজনকারী শক্তি সমাজকে শ্রেণী ও জাতিভিত্তিক বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, তখন পুজ্য সন্ত রবিদাসজীর জীবনবাণীর অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করে আমাদের সকলেরই দেশ ও সমাজের ঐক্য ও একাত্মতার জন্য কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সমাপ্তি অধিবেশনে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত শুরুতে সঙ্ঘের সংবিধান নিয়ে বলেন যে, আমরা অনেকেই সঙ্ঘের সংবিধান দেখিনি। সঙ্ঘ কাজ শুরুর সময় সংবিধানের প্রয়োজন হয়নি। সঙ্ঘের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য হলো সমাজের জন্য কাজ করা। সেজন্য স্বয়ংসেবকদের আত্মীয়ভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছিল। সামুহিক বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি স্নেহ, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির ভিত্তিতে সঙ্ঘকার্য শতবর্ষ ধরে চলছে। সঙ্ঘের সংবিধান ১৯৪৯-৫০ সালে তৈরি করা হয়, সময়ে সময়ে তাতে সংযোজনের প্রয়োজনও হয়েছে। সঙ্ঘের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা শূন্য থেকে শতবর্ষ পর্যন্ত বেড়েই চলেছে। ধর্মকাজে থাকলে সবসময় আনন্দ পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজ দেখিয়েছে যে, বিশ্ব আমাদের শুধু অনুকরণ করেছে এবং তা তাদের করতেই হবে। আমাদের দেশ এখনও পরমবৈভবশালী হয়নি, সেজন্য আরও অনেক কাজ করা দরকার। অন্তর্বাহ্য শুচিতা নিয়ে সাধনা করতে হয়। তার জন্য কর্তব্য পালন করে অধর্মের নাশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

যুদ্ধের এক পক্ষ সত্য, অন্য পক্ষ অসত্য এটা নয়। কেননা, প্রত্যেকের স্বার্থ আছে। এটা ধর্ম দৃষ্টি নয়। এসব তাৎকালিক পরিস্থিতিতে চলতে থাকে। লম্বা সময় ধরে চলবে এরকম নয়। রাজনৈতিক দলের চিন্তা শুধুমাত্র আগামী ভোটের লক্ষ্যেই থাকে। তাৎক্ষণিক সময়ে যেমন উত্থান হয়, তেমনি পতন তাড়াতাড়ি হয়। সঙ্ঘের চিন্তা দীর্ঘমেয়াদি ভাবনাতেই উন্নতি হয়েছে। দেশের জন্য জীবন-মরণ ভাবনা থাকতে হবে। আজ শতবর্ষ পরে সবাই হিন্দুত্বের কথা বলছে। আজ পঞ্চ পরিবর্তনের কথা সকলে স্বীকার করেছেন। অনুবর্তনের জন্য সরকার্যবাহ বক্তব্যে যা বলেছেন, সেভাবেই বাকি সমাজ আমাদের দিকে ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হবে। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। দেশের জন্য এটাই একমাত্র রাস্তা। জাগরণ শ্রেণীর কাজ হলে সংগঠন শ্রেণীরও যোগদান প্রয়োজন। দুই শ্রেণীকেই বলবান হতে হবে। দায়িত্ব না থাকলেও দেশের এই অনুকূল সময়ে কাজ করার জন্য সমাজকে সঙ্গে নিয়ে সবাইকে এগোতে হবে। চ্যাটজিপিটি যারা করছে, তাদেরও যুক্ত করতে হবে। সততার সঙ্গে, তন-মন-ধন দিয়ে, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে যারা কাজ করছে, বিরোধী হলেও তারা স্বয়ংসেবক।

পঞ্চ পরিবর্তন নিজের পরিবারে যদি সফল হয়, তবে অবশ্যই সমাজের পরিবর্তন হবে এবং তাতেই দেশের পরিবর্তন হবে। কার্যকর্তা ও অধিকারীদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই হিন্দুত্বের যে জোয়ার উঠেছে তাতে আগামী বিশ-ত্রিশ বছরে দেশ পরম বৈভবশালী হবে—এটা আমাদের বিশ্বাস। □

আড়ালে থাকা স্থপতি যুবরাজ, ভারতীয় ক্রিকেটের নীরব শক্তি

নিলয় সামন্ত

ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্যের গল্পে আমরা প্রায়ই দেখি ঝলমলে নাম, রেকর্ডভাঙা ইনিংস কিংবা ট্রফি জয়ের উল্লাস। কিন্তু এই আলোর নীচে, নীরবে কাজ করে চলা কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের অবদান সংখ্যায় মাপা যায় না, অথচ তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত হয় গভীরভাবে। সেই তালিকায় অন্যতম নাম যুবরাজ সিংহ। পাকিস্তানের ক্রীড়া সাংবাদিক সানাউল্লা খানের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই অদৃশ্য অবদানকেই সামনে নিয়ে এসেছে নতুন করে।

সানাউল্লার কথায়, ভারতীয় ক্রিকেট দলকে হারাতে গেলে শুধু মাঠের এগারো জনকে নয়, নজর রাখতে হবে যুবরাজ সিংহের উপরেও। কারণ এই মানুষটাই নেপথ্যে থেকে দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলছেন। তাঁর এই মন্তব্য নিছক প্রশংসা নয়, বরং এক গভীর পর্যবেক্ষণের ফল, যা নানা উদাহরণ দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমেই উঠে আসে সঞ্জু স্যামসনের প্রসঙ্গ। একসময় ফর্ম হারিয়ে যখন দিশেহারা সঞ্জু, তখন আচমকাই ফোন আসে যুবরাজের কাছ থেকে। কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, কোনো দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা নয়— শুধুই একজন সিনিয়র ক্রিকেটারের আন্তরিক আহ্বান। যুবরাজ তাঁকে বলেন, ব্যাটিঙে কিছু কাজ করার প্রয়োজন আছে, চলে আসতে। এই আহ্বানকে গুরুত্ব দিয়ে সঞ্জু এক মুহূর্ত দেরি না করে পৌঁছে যান যুবরাজের কাছে। এরপরের গল্প আজ সবার জানা— আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া, ব্যাটিঙে শাণিত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করা।

এখানেই শেষ নয়। সানাউল্লা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতের সাম্প্রতিক সময়ে পাওয়া বিস্ফোরক প্রতিভাদের মধ্যেও যুবরাজের ছাপ স্পষ্ট। তরুণ ক্রিকেটারদের মানসিকভাবে তৈরি করা, তাদের খেলার সূক্ষ্ম দিকগুলো শিখিয়ে দেওয়া— এই কাজগুলো যুবরাজ

করে চলেছেন নিঃশব্দে। কোনো প্রচার নেই, কোনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার চেষ্টা নেই, অথচ প্রভাব অসামান্য।

শুভমন গিলের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গিল নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর ক্রিকেট জীবনের উত্থানের পেছনে যুবরাজের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। শুধু টেকনিক নয়, মানসিক দৃঢ়তা, চাপ সামলানোর ক্ষমতা— এই সমস্ত বিষয়েই যুবরাজের দিকনির্দেশনা তাঁকে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য যে মানসিক শক্তি প্রয়োজন, সেটি গড়ে তুলতে এই ধরনের মেন্টরশিপ অমূল্য।

সানাউল্লা এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি আরও একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ তুলে ধরেছেন— ঋষভ পন্থ। ফর্মের ওঠানামা, চোটের পর প্রত্যাবর্তন— সব মিলিয়ে পন্থের জন্য সময়টা সহজ ছিল না। এমন সময় আবারও একই ছবি— যুবরাজের ফোন, তাঁর আহ্বান এবং পন্থের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া। এই ধারাবাহিকতা দেখেই সানাউল্লা বিস্মিত। তাঁর মতে, একজন ব্যক্তি যিনি কোনো প্রশাসনিক ভূমিকায় নেই, বোর্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন, এমনকী কোনো আনুষ্ঠানিক দায়িত্বও পালন করছেন না, তিনি এভাবে দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন— এটা ভাবাই কঠিন।

এই মন্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি বড়ো সত্য। আধুনিক ক্রিকেটে যেখানে সবকিছুই প্রায় কাঠামোবদ্ধ— কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, ডেটা অ্যানালিস্ট— সেখানে যুবরাজের মতো একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার নিজের উদ্যোগে এই কাজ করে চলেছেন। তাঁর এই ভূমিকা অনেকটা গাইড বা মেন্টরের মতো, যিনি শুধু খেলার কৌশল নয়, খেলোয়াড়দের মানসিকতাকেও গড়ে তোলেন।

যুবরাজ সিংহের নিজের ক্রিকেট জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, তিনি কীভাবে এই জায়গায় পৌঁছেছেন। কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করা, চাপে পারফর্ম করা এবং জীবনের বড়ো চ্যালেঞ্জ— ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করা— এই সব অভিজ্ঞতা তাঁকে আলাদা এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাই তিনি ভাগ করে নিচ্ছেন নতুন প্রজন্মের সঙ্গে।

ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান শক্তির অন্যতম কারণ হলো এই ধারাবাহিকতা— এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে অভিজ্ঞতার সঞ্চার। এই প্রক্রিয়ায় যুবরাজের অবদান নিঃসন্দেহে বিশেষ। তিনি কোনো আলোচনার কেন্দ্রে না থেকেও, নীরবে কাজ করে চলেছেন, আর সেটাই তাঁকে আলাদা করে তোলে।

সানাউল্লা খানের বক্তব্য তাই শুধু প্রশংসা নয়, বরং এক বাস্তবতার স্বীকৃতি। ভারতীয় ক্রিকেটের ভিত যতটা শক্তিশালী বলে মনে হয়, তার পেছনে রয়েছে এমন অনেক অদৃশ্য হাত, যাদের মধ্যে অন্যতম যুবরাজ সিংহ। মাঠে না থাকলেও, তাঁর প্রভাব আজও সমানভাবে অনুভূত হয়।

সম্ভবত এটাই একজন প্রকৃত ক্রিকেটারের পরিচয়— নিজের সাফল্যের সীমা ছাড়িয়ে, পরবর্তী প্রজন্মকে আরও উঁচুতে তুলে ধরার ক্ষমতা। যুবরাজ সেই কাজটাই করে চলেছেন, নিঃস্বার্থভাবে, নিরলসভাবে। আর সেই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেটের গল্পে তাঁর নাম চিরকাল এক বিশেষ মর্যাদায় থেকে যাবে।

ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক

এক দাঁড়কাকের মনে খুব দুঃখ। এত কালো, কুৎসিৎ দেখতে তাকে। কেউ তাকে ভালোবাসে না এত বিশ্রী সে।

একদিন সে গাছের ডালে বসে কা কা

করছে। হঠাৎ দেখে, পাশেই এক জায়গায় বেশ কয়েকটা ময়ূরপুচ্ছ পড়ে আছে। দেখে তার মনে যেন দুঃখ আরও বেড়ে গেল।

হায় রে! এই পৃথিবীতে কত সুন্দর পাখি এই ময়ূর। কী সুন্দর দেখতে। সবাই তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর আমি! আমার কোনো রূপই নেই, যেমন গলা তেমনই গায়ের রং।

এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কী মাথায় ঢুকলো কে জানে। ময়ূরপুচ্ছগুলো নিয়ে সে ঠিক করল নিজের ডানায় বসিয়ে নেবে। তাহলেই তো আর কোনো ভাবনা নেই, সেও দেখতে ময়ূরের মতো সুন্দর হয়ে যাবে।

এই ভেবে দাঁড়কাক গাছ থেকে নেমে একটি একটি করে পুচ্ছগুলি নিজের ডানায় আটকে নিল। সবগুলি ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে মনে মনে সে বেশ আনন্দিত হলো। তার মনে হলো, এই তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে। আর আমাকে কেউ বিশ্রী বলে ঘৃণা করবে না।

এমন সময় কোথা থেকে কয়েকটা কাক এসে তার কাছে জুটল। তারা একসঙ্গে ওই দাঁড়কাককে বলল, আরে! তুমি নিজের ডানায় এগুলো লাগালে কেন? এগুলো তো ময়ূরপুচ্ছ!

দাঁড়কাকাটি তখন নিজেকে পরম রূপবান মনে করছে। যে তার জাতভাইদের পাত্তাই দিল না। উলটে বলল, তোমরা খুব বিশ্রী, কুৎসিৎ। ছিঃ ছিঃ! আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবো না। দূর দূর!

এভাবে গালাগালি দিয়ে সেখান থেকে দূরে একটি গাছে বসে তার মনে হলো, এবার ময়ূরের দলে গিয়ে ভিড়লেই তো হলো। আমাকে তারা নিশ্চয় বন্ধু ভেবে দলে নেবে। এই ভেবে সে জঙ্গলে গিয়ে ময়ূরের দলে ভিড়ল।

ময়ূরেরা তো তাকে দেখেই বুঝতে পারল, এ একটা দাঁড়কাক। জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা ময়ূরপুচ্ছ নিজের ডানায় লাগিয়ে নিয়েছে। তাতেই নিজেকে ময়ূর ভাবতে শুরু করেছে। এত বড়ো সাহস এর। আবার আমাদের সঙ্গে কিনা বন্ধুত্ব করতে এসেছে। তারা সবাই মিলে দাঁড়কাকটিকে ঘিরে ফেলে ঠোকরাতে শুরু করল। আর একটা একটা করে তার সব পালক তুলে ফেলে তাকে তাড়িয়ে দিল।

মনের দুঃখে দাঁড়কাকটি আবার তার জাতভাইদের কাছে ফিরে এল। তারা বলল, খবরদার, আমাদের সঙ্গে মিশবে না। যেখানে গিয়েছিলে তার কী হলো? তা ময়ূরেরা তোমাকে খুব আদর-যত্ন করেছে নিশ্চয়ই! লজ্জা করে না তোমার? নিজের জাতভাইদের অপমান করে চলে গিয়ে আবার আমাদের কাছে এসেছ? যাও যাও! যেখানে খুশি সেখানে চলে যাও। এই বলে সবাই মিলে তাকে তাড়িয়ে দিল। বেচারা মনের দুঃখে অন্য একটি গাছের ডালে গিয়ে বসল।

ছোটো বন্ধুরা, কোনো মানুষ যদি নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাকে কারও কাছে অপমানিত হতে হয় না।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

কেওলাদেও

রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান। এর আয়তন ২৮.৭ বর্গকিলোমিটার। উদ্যানটি একটি বিশাল জলাভূমি, বনভূমি ও তৃণভূমি নিয়ে গঠিত। ১৯০০ সাল পর্যন্ত এটি মহারাজাদের শিকার ক্ষেত্র রূপে সংরক্ষিত ছিল। ১৯৫৬ সালে এটিকে পক্ষী উদ্যানে পরিণত করা হয়। ১৯৮২ সালে জাতীয় উদ্যান রূপে এটিকে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা লাভ করে। শীতকালে এই উদ্যানে ৪০০ প্রজাতির পক্ষী দেখা যায়। এছাড়াও, ২০ প্রজাতির মাছ, ৭০ প্রজাতির সরীসৃপ ও উভচর এবং ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বাস করে এই উদ্যানে। সমগ্র উদ্যানটি ১৭টি গ্রাম এবং ভরতপুর শহর দ্বারা বেষ্টিত। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি এই উদ্যান পরিদর্শনের উপযুক্ত সময়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০

কুত্র দ্বারা প্রশ্ন

('কোথায়' দ্বারা প্রশ্ন)

অভ্যাসং কুর্মঃ –

ভবতঃ মাতা কুত্র অস্তি ?

আপনার মা কোথায় আছেন ?

চষকঃ কুত্র অস্তি ?

গেলাস কোথায় আছে ?

গীতং কুত্র ভবতি ?

গান কোথায় হচ্ছে ?

ভবতি কুত্র গচ্ছতি ?

আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

ভবান্ কুত্র পঠতি ?

আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন ?

কুত্র দ্বারা প্রশ্নং কুর্বন্তু।

'কোথায়' দিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করব।

ভালো কথা

মৌটুসি

কদিন থেকেই একটা চকচকে কালো আর একটা ধূসর লম্বা বাঁকা ঠোঁটওয়ালা ছোট্টো পাখি আমাদের বাগানে উড়ে উড়ে ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছিল। বাবা বললেন, ওদের কালোটি পুরুষ আর ধূসরটি মেয়ে মৌটুসি। তার কদিন পরেই দেখি, বাগানের জবাগাছটির ডালে ঝুলানো একটি লতায় ওরা তুলো, মাকাড়সার জাল আর খড়কুটো দিয়ে বাসা বুনতে শুরু করেছে। তিনদিন পর মা মৌটুসি দুটো ডিম পেড়ে তা দিচ্ছে আর লম্বা ঠোঁট-সহ মাথাটি বাইরে বের করে রেখেছে। দুটিই পালা করে তা দিচ্ছে। মা বলল, এখন ওদের বাসার কাছে যাবি না। আমি দূর থেকেই ওদের দেখি। ভাবছি, কবে ডিম ফুটে ছানা হবে।

জ্যোতি পাল, সপ্তম শ্রেণী, রানাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বর্ষা প্রিয়

রিদ্ধিমা শাসমল, নবমশ্রেণী, আরামবাগ বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি, হুগলী।

কে বলে যে বর্ষা প্রিয়
ঘরে একা থাকা,
বন্ধু-বান্ধব, পাখপাখালি
পাই না কারোর দেখা।
সারাটা দিন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর
ব্যাঙের শুধু ডাকা,
রোদ ওঠে না অন্ধকারে
ভ্যাপসা ঘরে থাকা।

রাস্তাঘাটে জল জমে যায়
বন্যা দিকে দিকে,
ঘরে বসে হাতে ব্যথা
খাতায় লিখে লিখে।
গবির-দুঃখী যাচ্ছে ভেসে
বর্ষা বানের জলে,
বর্ষা প্রিয়– এই বলে কি
ধনির বিলাস চলে ?

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

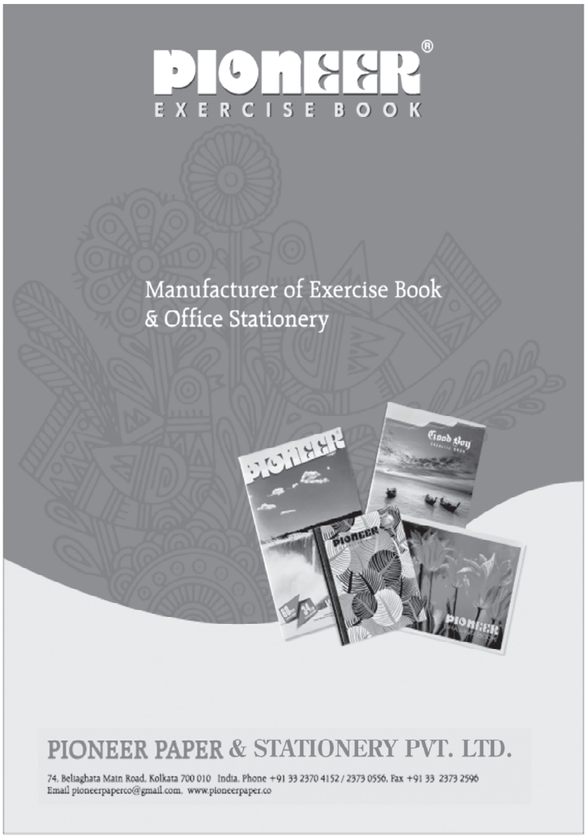

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

মাওমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে

মাওবাদী লালসন্ত্রাস এখন লালগড়েও খাদের কিনারায়

দুর্গাপদ ঘোষ

মাওবাদী আন্দোলনের আঁতুড়ঘর পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৬৭ সালের ১৮ মে দার্জিলিং জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম নকশালবাড়ির এক জমিদার বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালায় স্থানীয় জনজাতির কৃষকরা। মাওবাদীদের ভাষায়, ওই হামলা ছিল— কৃষক বিদ্রোহ। বাস্তবে এটা ছিল এক চরম নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে চিকেন নেককে চীনা উপনিবেশে পরিণত করার। যার প্রধান মস্তিষ্ক ছিলেন শিলিগুড়ি এলাকার এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারের সদস্য এবং বাম বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত চারু মজুমদার। কানু স্যান্যাল এবং জঙ্গল সাঁওতালের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। তখন এ রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল নবগঠিত 'বাংলা কংগ্রেস'-এর নেতা অজয় মুখার্জির মুখ্যমন্ত্রিত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার। উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চারুবাবু তখন ছিলেন দলের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং (অথবা মাও-জে-দং)-এর বিপ্লবী তত্ত্বে জারিত হয়ে চারুবাবু মনে করতেন বন্দুকের নলই পরম্পরাগত সমাজ এবং প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারবে।

অর্থাৎ হিংসাত্মক বিদ্রোহ। 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' এটাই ছিল কালক্রমে মাওবাদী চারু মজুমদারের বৈপ্লবিক তত্ত্ব। নকশালবাড়ি থেকে এই তত্ত্বের প্রয়োগ শুরু হয়েছিল বলে এই অতি উগ্র বামপন্থী আন্দোলন 'নকশালবাদী আন্দোলন' পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো ভারতবর্ষের মতো শান্তিপ্রিয় দেশে উগ্র মাওবাদী সন্ত্রাস। নকশালবাড়ির ঘটনার দু'বছর পরে ১৯৬৯ সালে চারুবাবু সিপিআই এমএল তৈরি করেন। কালক্রমে সেই দল পরিষদীয় রাজনীতির আঙিনায় ঢুকে পড়ায় অতি উগ্র বামমার্গীরা সিপিআই (মাওবাদী) নামে নতুন সংগঠন গড়ে তোলে। সে কারণে নকশালবাদীদের এখন মাওবাদী বলা হয়ে থাকে। নকশালবাড়ি জনপদ এখন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। নকশালবাড়ির মানুষ এখন সবাইকে অনুরোধ করেন একদা সৃষ্ট ওই হিংসাত্মক আন্দোলনকারীদের মাওবাদী নামে অভিহিত করা হোক, নকশাল নামে নয়। তাই আমরা এই প্রসঙ্গে 'মাওবাদ' অথবা 'মাওবাদী' নামেই উল্লেখ করব।

কয়েক দশক ধরে আগুনের ফুলকির মতো ত্রাস সৃষ্টি করলেও পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতে এমনকী ছত্তিশগড়েও মাওবাদী জঙ্গিদের অস্তিত্ব এখন প্রায় খাদের কিনারায় এসে ঠেকেছে। যেখানে যেখানে তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাস কিছুটা বজায় রয়েছে তা মুখ্যত জঙ্গল ঘেরা গ্রামীণ এলাকায়। বিশেষত জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে।

নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দির

ফঃ ৬

যদিও শুরু হওয়ার পর কেবল কৃষক ও গ্রামীণ ক্ষেত্র নয়, তীব্র মাত্রায় মাওবাদ সংক্রামিত হয়েছে শহরকেন্দ্রিক এলাকার ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যেও। বিশেষ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতো উচ্চ মেধার পড়ুয়া, কর্মচারী, এমনকী শিক্ষকদের একাংশও মাওবাদে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু কৃষকদের দিয়ে প্রথম এই হিংসাত্মক সন্ত্রাস শুরু করা হয়েছিল কেন তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনীতিকদের মধ্যে। এ বিষয়ে বিদগ্ধ চিন্তাবিদ ও প্রতিথযশা বক্তা অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর মতো রাজনীতিবিদের মতে, অন্যতম মৌলিক কারণ ছিল রাশিয়ায় কৃষকদের মাধ্যমে বিপ্লব সংঘটিত করে জারতন্ত্রের পতন ঘটানোয় সাফল্য লাভের দৃষ্টান্ত। বস্তুত সোভিয়েত রাশিয়ায় তৎকালীন স্বৈরাচারী ও মহা প্রতিপত্তিশালী জার, যেমন আলেকজান্ডার নেবেস্কি, দিমিত্রি জনস্কয় প্রমুখর বিরুদ্ধে কার্ল মার্কসের অনুগামী লেনিন, স্তালিন, ট্রটস্কিদের মতো নেতারা সে সফল বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তার প্রধান জনশক্তি ছিল রাশিয়ার কৃষকরা। চারু মজুমদাররা মনে করেছিলেন, অজয় মুখার্জির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের প্রধান শক্তি যেহেতু জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন চীনাপন্থী সিপিআই(এম) দল, সুতরাং সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁদের (চারুবাবু) তত্ত্বগত 'জনযুদ্ধ' শুরু করার উপযুক্ত সময় হলো এটাই। এবং ঘটনা হলো, নকশালবাড়ি থেকে গজিয়ে ওঠা আন্দোলনের নামে অরাজকতা দ্রুত মাত্রাছাড়া হলেও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার তথা বামপন্থী নেতাদের তা কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তেমন সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। প্রয়াত হরিপদবাবুর মতে, বাম নেতাদের গা-না করা ভূমিকাকে চারুবাবুরা তাঁদের ওই হিংসাত্মক আন্দোলনের পেছনে প্রশাসনিক শক্তির সমর্থন রয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন।

অনুকূল বাতাসে আগুন যেমন লেলিহান হয়ে উঠে সবকিছুকে দ্রুত গ্রাস করে, কমিউনিস্ট নেতাদের গা-ছাড়া মনোভাব চারুবাবুর মতো অনেকে মাওবাদী আন্দোলনের সমর্থনে অনুকূল বাতাস মনে করে ওই হিংসাত্মক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে পড়ুয়াদের মধ্যে ভাইরাসের মতো সংক্রামিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে মাওবাদীদের আধুনিক মনস্ক মনে করে তাদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতির সুরে সানাই বাজাতে নেমে পড়েন কিছু লেখক-লেখিকা এবং কিছু সাংবাদিক-সহ এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। ফলে অধিকাংশ সাধারণ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ বিভ্রান্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে। নকশালবাড়িতে পরপর হিংসাত্মক ঘটনার খবর প্রায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রীতিমতো উৎকণ্ঠা বোধ করতে থাকে। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, ট্রেনে-বাসে সকলের মধ্যেই মুখ চাওয়াচাওয়ি, একটা কী হয়, কী হয় প্রশ্ন। প্রথম দিনের হামলার ৫ দিনের মাথায় ২৩ মে কয়েকজন কৃষকের হাতে নিহত হন সোনাম ওয়াংডি নামে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। পুলিশ ফোর্স পাঠানো হলে তার ২ দিনের মাথায়, ২৫ মে নকশালবাড়ি লাগোয়া প্রসাদজ্যোত এলাকায় পুলিশ বাহিনী এবং স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের গুলিতে ১১ জনের মৃত্যু হয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সূত্র অনুযায়ী একদিকে আন্দোলনের নামে রক্ত ঝরানো হামলা, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণে নেমে স্থানীয় কৃষকদের গুলি করে হত্যা করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মতান্তর শুরু হয়েছিল। পরিণতিতে সে বছরের ২১ নভেম্বর অজয়বাবুর সেই জোট সরকারের পতন ঘটে। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রিত্বে শপথ নেন ড. প্রফুল্ল ঘোষ।

প্রসঙ্গত, স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ড. ঘোষই হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪৮ সালের ২২ জানুয়ারি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হন। তার আগে ৫ মাস ১ সপ্তাহ বহাল ছিল ড. ঘোষের সরকার। কিন্তু ড. প্রফুল্ল ঘোষের দ্বিতীয় (জোট) বারের সরকারও বেশিদিন টেকেনি। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ১৯৬৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর সরকারের পতন ঘটিয়ে এ রাজ্যে প্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। জ্যোতিবাবুরা রাজ্যপাল ধর্মবীরের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ-আন্দোলন চালাতে থাকেন। এদিকে ক্ষমতা দখলের ওই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে নখ-দন্ত বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায় মাওবাদীরা।

প্রায় ১ বছর যাবৎ রাষ্ট্রপতি শাসনের পর ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি আবার অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ডামাডোল চলতে থাকায় ১৯৭০ সালের ৩০ জুলাই পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয়। বহাল থাকে ১ বছর ৪ মাস। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল অজয়বাবু পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হলেও সেবারও তাঁর সরকার ৩ মাসের বেশি টিকে থাকতে পারেনি। প্রচণ্ড রাজনৈতিক জল ঘোলার কারণে ২৫ জুন আবার রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয়। এরপর ১৯৭২ সালের ২০ মার্চ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। মাওবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে ধান ভাঙতে শিবের গীত'-এর মতো এ রাজ্যের তৎকালীন রাজনীতির এত বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার কারণ হলো, একটানা প্রায় ৫ বছর ধরে এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার উথাল-পাথালে যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযোগে মাওবাদীরা সে সময় প্রায় ঝড়ের গতিতে রাজ্যজুড়ে দাপিয়ে বেড়ানোর অনুকূল পরিবেশ পেয়ে গিয়েছিল। যার পরিণতিতে পরবর্তীকালে ভারতের এক বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি হয় 'রেড করিডোর'। সে সময় ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতির মসনদ সামলাতে গিয়ে গোটা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা এতটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা চরম হতাশার মনোভাব তৈরি হয়।

অন্যদিকে, রাজধানী কলকাতা-সহ রাজ্যের নানা জায়গায় প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক বিভিন্ন ধরনের নাশকতা, গুলি-বোমা, হত্যা-জখমের ঘটনা ঘটতে থাকে। লাল সন্ত্রাস সংক্রমণের মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে একাধিক বাম নেতা এই অতি বামে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন শিয়ালদহ-বৌবাজার এলাকার সারপেনটাইন লেন এবং

ফরডাইস লেনের সংযোগস্থলে থাকা প্রভাবশালী সিপিএম নেতা মুকুর সর্বাধিকারী যার সে সময় কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র হওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি হঠাৎ মাওবাদী হয়ে যান। তার অনুগামী হিসেবে পরিচিত কয়েকটি ছেলে একদিন মুচিপাড়া থানার প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে বড়োজোর ৩০-৪০ ফুট দূরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লেবুতলা শাখার (সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার) ওপরে হামলা চালায়। যদিও ওই শাখার স্বয়ংসেবকদের পালটা প্রতিরোধের দরুন লাঠির ঘায়ে তাদের দু'তিন জনকে এনআরএস হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। ১৯৭২ সালে মুকুরবাবুকে অবশ্য জেলে যেতে হয়েছিল। মাওবাদীদের এই ধরনের ঘটনাগুলো 'জনযুদ্ধ' তথা সমাজব্যবস্থা বদলের কোন পর্যায়ে পড়ে সেটা রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বিশ্লেষণ করতে পারবেন। এই নিবন্ধে কেবল তৎকালীন মাওবাদী সন্ত্রাসের খুব ভাসা-ভাসা দু'এক টুকরো ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

তখনকার একটা অনেক বড়ো ও মারাত্মক ঘটনা হলো হেমন্ত বসু হত্যা। যা সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের স্বনামধন্য নেতা হেমন্ত বসু যাঁকে দলমত নির্বিশেষে অনেকে 'অজাতশত্রু' বলতেন, তাঁর বাড়ি ছিল উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়া এলাকায়। ১৯৭১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুরের একটু আগে তিনি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় শ্যামবাজারের কাছাকাছি টাউন স্কুলের পাশের রাস্তায় কয়েকটা ছেলে তাঁকে একেবারে সামনাসামনি পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে। হাড় হিম করা ওই হত্যার ঘটনাকে পুলিশ মাওবাদীদের কাজ বলে চিহ্নিত করলেও বাম নেতারা সরকারিভাবে স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করেননি। ওই ঘটনার পরেও মাওবাদী আন্দোলনের 'মস্তিষ্ক' চারু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সরকারের আমলে ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হেমন্ত বসু হত্যার ঘটনায় পুলিশ পাণ্ডবেশ্বর মুখার্জি নামে ওই এলাকারই একটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। পাড়ায় তার ডাকনাম ছিল 'পাণ্ডে'। বাড়িতে ডাকা হতো 'গৌর' বলে। কিছুদিন গা-ঢাকা দেবার পর অসমের এক আশ্রম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়। সেখানে সে নতুন 'ব্রহ্মচারী'-র ভেক ধরে লুকিয়ে ছিল।

হেমন্ত বসু হত্যার কয়েকদিন পরে চারুবাবুও আত্মগোপন করেন। তারপর ১৯৭২ সালের উল্লেখিত ১৬ জুলাই কলকাতার এন্টালি থানার প্রায় নাকের ডগায়, শিয়াদহ দক্ষিণ শাখার রেললাইনের ধারে একজনের বাড়ির এক ফ্ল্যাটে থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ওই বাড়ির মালিক পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে দু'টি অল্পবয়সি ছেলে-মেয়ে তাঁদের কাকুতি-মিনতি করে জানিয়েছিল যে তাদের মামা খুব অসুস্থ। কলকাতায় চিকিৎসা করাতে এনেছে কিন্তু থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। এজন্য পৃথক ব্যবস্থার দু'খানা থাকার ঘর জরুরি। 'অসুস্থ' মানুষকে দেখে কোনো সন্দেহ না করে ঘর ভাড়া দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, চারুবাবু এমনিতে অত্যন্ত ক্ষীণকায় ছিলেন। দেখলে আপাতদৃষ্টিতে অসুস্থ মনে হতো, তাছাড়া তখনও পর্যন্ত তাঁর একান্ত পরিচিতরা ছাড়া তাঁকে তেমন কেউ চিনতেন না। তখন সচিত্র পরিচয় পত্রাদিরও বিধিব্যবস্থা তেমন চালু হয়নি। গ্রেপ্তার হওয়ার মাত্র ১২ দিনের মাথায় ২৮ জুলাই জেলে থাকাকালীনই চারু মজুমদারের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পরিচালনাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র দমন নীতি গ্রহণ করা হয়। একদিকে মাওবাদীদের পাইকারি হারে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে, অন্যদিকে পুলিশের গুলিতে অনেক অল্পবয়সি 'মাওবাদী'র মৃত্যু ঘটে। ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর সরকার ক্ষমতায় ছিল। যার মধ্যে ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাত থেকে ইন্দিরা গান্ধীর বলবৎ করা ২১ মাসের জরুরি অবস্থাও। অভিযোগ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জমানায় মাওবাদী নিয়ন্ত্রণের নামে অনেক সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কংগ্রেস বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়নের রোডরোলার চালানো হয়েছিল। সে সময় ১,২০০ জনেরও বেশি মাওবাদী নিহত হয় এবং বেশ কয়েক হাজার জন পালাতে বাধ্য হতে হয় বলে খবর মেলে। তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে যথারীতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন বামেরা। বাম বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধার্থশঙ্কর সরকারের ওই দমন নীতিকে 'সেমি ফ্যাসিস্ট টেরর' অর্থাৎ আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস বলে অভিহিত করেন।

অন্যদিকে সিদ্ধার্থশঙ্করবাবুর পালটা অভিযোগ ছিল, মাওবাদীরা হিংসার মাধ্যমে তাঁর সরকারের পতন ঘটাতে উদ্যত হয়েছে। রাজ্যে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করছে। তবে ঘটনা হলো, ক্ষমতা দখলের ধড়িবাজি

> **এ রাজ্যের বর্তমান কিংবা নতুন সরকার যদি কেন্দ্র সরকারের 'মাওবাদীমুক্ত ভারত' নীতির সঙ্গে একযোগে এগিয়ে আসে এবং হতবল হয়ে পড়া বাকি মাওবাদীদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি আত্মসমর্পণ করিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করে, তাহলে অচিরেই মাওবাদীদের এই প্রসূতিগৃহেও লালসন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদ ঘটতে পারে।**

রাজনীতির এই সমস্ত প্যাঁচপঁয়জার, অভিযোগ-পালটা অভিযোগের চাপান-উতোর যাই চলুক, পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ তখন খুব দ্রুত হারে স্তিমিত হয়ে আসে। অনেক মাওবাদী অন্যত্র বিশেষ করে বর্তমান ঝাড়খণ্ড, অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গায় পালিয়ে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে থাকে। ক্রমে ভারতের প্রায় এক ডজন রাজ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জাল তারা বিস্তার করে। মাওবাদীদের ঘাঁটি গড়ে ওঠে নেপালেও। অনেকে আস্তানা গাড়ে এ রাজ্যের বর্তমান ঝাড়গ্রামের লালগড় প্রভৃতি জঙ্গলমহল এলাকায়। ১৯৭২ সালের পরও পশ্চিমবঙ্গ মাওবাদীমুক্ত রাজ্য হয়ে যায়নি। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন যে, সে সময় বন্দুকের বদলে বন্দুক, কেবলমাত্র প্রতিহিংসামূলক এই দমন নীতি না নিয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার যদি মাওবাদী সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতির পাশাপাশি তাদের আত্মসমর্পণ করিয়ে আকর্ষণীয় পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু করত, তাহলে হয়তো তা সুফলদায়ী হতে পারত। মাওবাদী সন্ত্রাস এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো না। প্রায় ৬ দশক ধরে তাদের হিংসাশ্রয়ী দৌরাত্ম্যকে তার অঙ্কুরে উপড়ে ফেলার চেষ্টা যেমন হয়নি, তেমনি সিদ্ধার্থশঙ্কর সরকারও দমননীতি ছাড়া সদর্থক ও ইতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা ভাবেনি।

সিদ্ধার্থশঙ্কর সরকারের ভূমিকায় মাওবাদীদের ‘জনযুদ্ধ’ আগুনে ভাটা পড়তে দেখা গেলেও ভেতরে ভেতরে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। থেকে থেকে ঘটতে থাকে গুপ্ত হামলার মতো ঘটনা। স্থানে স্থানে জঙ্গলের গভীরে যেমন গুলি-বন্দুকের প্রশিক্ষণ চলতে থাকে, পাশাপাশি কোথাও কোথাও তাদের ‘জনতার সরকার’ স্থানীয় লোকেদের ওপর সমান্তরাল শাসন তথা সশস্ত্র সন্ত্রাস কায়েমের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। গজিয়ে ওঠে লালগড়ের ছত্রধর মাহাতোর মতো কিছু প্রভাবশালী নেতা। যাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে থাকে ‘কিষেণজী’-র মতো মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা। ছত্রধর মাহাতো অবশ্য বরাবরই নিজেকে একজন ‘সমাজকর্মী’ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে এসেছেন যদিও ২০০৮ সালের নভেম্বরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে গিয়েছিল। ওই ঘটনায় পুলিশ তাঁকে লালগড় থেকে গ্রেপ্তার করে। তখন থেকে পরপর কয়েক বছর জঙ্গলমহল এলাকায় একাধিক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়েছে মাওবাদীরা।

ঝাড়গ্রামের বাঁশতলা এলাকায় ভুবনেশ্বর-রাজধানী এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে ২০০৯ সালের ২৭ অক্টোবর। ছত্রধরের মুক্তির দাবিতে প্রায় ৩০০ জন মাওবাদী ৫ ঘণ্টা যাবৎ যাত্রীদের অবরোধ করে রাখে। যদিও সরকারিভাবে ওই ট্রেন ছিনতাই করেছিল ‘পিপল’স কমিটি এগেইনস্ট পুলিশ অ্যাট্রোসিটিস’ (পিসিএপিএ) বা পুলিশি নির্যাতন-বিরোধী জনগণের সমিতি। যার আহ্বায়ক ছিলেন ছত্রধর মাহাতো। সংস্থাটি যে মাওবাদী মদতপুষ্ট তা সর্বজনবিদিত। তীব্র উৎকণ্ঠার পর কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সিআরপিএফ এবং রাজ্যের পুলিশ বাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে ট্রেনটিকে মুক্ত করে। ২০১০ সালে জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ (ইএফআর)-এর ২৯ জন জওয়ান-সহ নিরাপত্তা বাহিনীর মোট ৪৯ জওয়ানকে হত্যা করে। পুলিশের গুলিতে ৭ জন মাওবাদীও নিহত হয়।

এই সমস্ত ঘটনার পেছনে সিপিআই (মাওবাদী)-র পলিটব্যুরো এবং তাদের কেন্দ্রীয় মিলিটারি কমিশনের সদস্য মাল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে ‘কিষেণজী’-র হাত থাকার অভিযোগ ওঠে। ২০১০ সালের ২৮ মে মাওবাদী নাশকতার শিকার হয় মুম্বইগামী জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় ১৪৮ জনের মৃত্যু হয়। এরপর গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে ‘কোবরা’ কমান্ডো বাহিনী জঙ্গলমহলে অভিযান চালায়। ওই অভিযানে ২০১১ সালের ২৪ নভেম্বর ‘কিষেণজী’ নিহত হয়। সে অভিযানে ‘কোবরা’-কে সাহায্য করার জন্য প্রায় ১ হাজার সিআরপিএফ জওয়ানকেও নামানো হয়েছিল। কত বড়ো অভিযান চালাতে হয়েছিল এ থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে।

একদিকে ‘কিষেণজী’-র মতো নেতা যাকে মাওবাদীদের ‘মুখ’ বলা হতো তার নিহত হওয়ার ঘটনা, অন্যদিকে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ছত্রধর মাহাতো ২০২০ সালের জুলাই মাসে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য হওয়ার ঘটনায় এ রাজ্যে মাওবাদীদের পেশি আস্ফালনের ক্ষমতা অনেকটাই শিথিল হয়ে গেছে। এখন সীমিত এলাকার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব ও গতিবিধি বজায় থাকলেও বড়ো ধরনের হামলা করার শক্তি হারিয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। বলাবাহুল্য, এটাই সবচাইতে ভালো সুযোগ। এ রাজ্যের বর্তমান কিংবা নতুন সরকার যদি কেন্দ্র সরকারের ‘মাওবাদীমুক্ত ভারত’ নীতির সঙ্গে একযোগে মিলিয়ে এগিয়ে আসে এবং হতবল হয়ে পড়া বাকি মাওবাদীদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি আত্মসমর্পণ করিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করে, তাহলে অচিরেই মাওবাদীদের এই প্রসূতিগৃহেও লালসন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদ ঘটতে পারে। আর সেটা হলে তখন জঙ্গলমহলের মানুষও স্বস্তির শ্বাস নিতে পারবে। সফল হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র ‘মাওবাদী মুক্ত ভারত’ গড়ার অঙ্গীকার। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

আমার সঙ্ঘজীবনের ইতিকথা

অবনীভূষণ মণ্ডল

পাশাপাশি গ্রাম থেকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে বন্দুক, লাঠি, বর্শা হাতে পুলিসের দিকে ধাওয়া করলো। 'মারো মুলায়েমের পুলিশকে' বলে ধেয়ে এল। ততক্ষণে পুলিশ রান্নার কড়াই ইত্যাদি উল্টে দিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর উদ্যোক্তরা আমাদের একটি লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তারা রাতের খাবার সংগ্রহ করে আমাদের জন্য নিয়ে এলো। খাওয়া দাওয়ার পর আবার দেখা গেল পুলিশ এসেছে আমাদের খোঁজে। তখন তাদের নির্দেশমতো আখের ক্ষেতে লুকিয়ে পড়লাম। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, তাই রাতেই পরবর্তী গ্রামের দিকে রওনা হলাম। অনেকখানি মাঠ পেরিয়ে একটি গ্রামে পৌঁছালাম। সঙ্গে এসেছে দুজন। একজনের হাতে একটি বর্শা ও অন্যজনের হাতে একটি বন্দুক। ওই গ্রামে যখন পৌঁছালাম তখন প্রায় রাত্রি ২টা। সেখানে একটি ফাঁকা ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে পড়লাম। ভোর হতেই আবার রওনা। এবার পৌঁছালাম এক প্রধানের গ্রামে। সেখানে সকলকে চা দিয়ে আপ্যায়িত করা হলো। বললেন, আপনারা আখের ক্ষেতে বিশ্রাম করুন, এই রাস্তাটি নিরাপদ নয়। সেখানে ক্যানেল আছে তাতে আপনারা স্নানাদি করতে পারেন। এরপর আর আপনাদের খাবার জুটবে না। তাই আমরা আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করছি। বেলা ১০ টার সময় ডাল-ভাত-আচার খেয়ে আবার আমরা হাঁটতে লাগলাম। বড়ো রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা সবসময় পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। খুব সন্তর্পণে রাস্তা পার করতে করতে চলেছি। বিকেল ৪টার সময় লাইন দিয়ে আমাদের যেতে দেখে পুলিশ আমাদের আটকাল। কিন্তু আমাদের দাবি অনুযায়ী থানা থেকে পুলিশ ভ্যান এলে তাতে চড়ে কোতোয়ালিতে পৌঁছালাম। আমরা অযোধ্যার অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছি বলে আমরা নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য আমাদের অনেক দূরে জেলে নিয়ে যাওয়া দরকার। সরকারি বাসে ওখান থেকে রাত্রি ৯ টায় রওনা। খুব সকালেই লক্ষ্ণৌ পৌঁছালাম। ওখান থেকে রায়বেরিলি দিয়ে বিকেল ৪টায় 'নৈনিতাল মুক্ত জেলে' পৌঁছালাম। পথমধ্যে হিন্দুরা জানতে পেরে গাড়ি থামিয়ে বিভিন্ন রকম খাবার বাসে তুলে দিচ্ছিল। ওই খাবার গাড়িতে থাকা পুলিসও খাচ্ছিল। নৈনিতাল জেলে প্রায় সাড়ে চার হাজার বন্দি করসেবক, বেশিরভাগ এসেছে বাহারাইচ জেলা থেকে। সকলেই স্বয়ংসেবক। ওখানে আমরা শাখার কার্যক্রম শুরু করে দিলাম। প্রথম কয়েকদিন রান্না করা খাবার দিচ্ছিল, পরে এক একটি গ্রুপকে রান্নার উপকরণ দিলে আমরা রান্না করে নিচ্ছিলাম। ৩০ অক্টোবর খবরে জানতে পারলাম অযোধ্যায় গুলি-গোলা চলেছে, তাতে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এটাও জানা গেল কয়েকজন পুলিশের ব্যারিকেড কাটিয়ে বিতর্কিত ধাঁচার উপরে উঠে গৈরিক পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। তখন মোবাইল ফোন চালু হয়নি। ল্যান্ড ফোনের মাধ্যমে বাপী সেন বাঁকুড়ায় খবর পাঠায়। ওখানে কর্মরত লোকেদের বাড়িতে ফোন ছিল। আমার ছেলে দীনদয়াল প্রথম ব্যাচে করসেবায় রওনা হয় কিন্তু তারা কোথায় বা আমরা কোথায়? বাড়িতে খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। এদিকে অযোধ্যায় গুলি চালানোর খবরে চিন্তা আরও বেড়ে যায়। অতপর ১০ দিন নৈনিতাল জেলে থাকার পর আমরা মুক্তি পেলাম। আমরা বললাম আমরা অযোধ্যায় যেতে চাই। সেই দাবি অনুযায়ী সকলকে বাসযোগে অযোধ্যায় পৌঁছে দিল। কঠিন প্রহরায় ঘেরাটোপে অযোধ্যায় রামলালাকে দর্শন করে ট্রেনে বাড়ি ফিরলাম। পরে জানতে পারলাম জীর্ণ মন্দিরের চুড়ায় গৈরিক পতাকা লাগানোয় কোঠারী পরিবারের রামকুমার ও শরৎকুমার এই দুই ভাইকেই মুলায়মের পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। অশোক সিংহলজীর মাথা ফাটিয়ে দেয়। এটাও জানা গেলে P.A.C (U. P. Police) করসেবকদের উপর গুলি চালাতে রাজি না হওয়ায় কেরল থেকে মুসলমান পুলিশ নিয়ে এসে এই কাজ করেছে। কত সাধু, সন্ত ও করসেবক মারা যায় তার কোনো হিসাব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অনেকেই অনুমান করেন মৃতদেহগুলি বস্তাবন্দি করে সরযূর জলে ফেলে দেওয়া হয়।

১৯৯১ সালে আমার উপর দায়িত্ব পড়লো মেদিনীপুর বিভাগের সহ-বিভাগ কার্যবাহের। বিভাগ কার্যবাহ ছিলেন অ্যাডভোকেট লহর মজুমদার। ১৯৬৬ সাল থেকে বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা বর্গে মুখ্য শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে, শালবনীতে প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ হয়। ১৯৬৭-১৯৭৮ প্রতি বছরই প্রথম বর্ষে শিক্ষক

হিসাবে কাজ করেছি। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার বছরে শিক্ষক হিসেবে যেতে পারিনি। ১৯৮২ সাল থেকে আবার ২য় বর্ষের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই। ১৯৮৫ সালে ২য় বর্ষ তিনটি প্রাপ্ত এক সঙ্গে (ওড়িসা, অসম ও পশ্চিমবঙ্গ) পুরীর ভোলানাথ বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৫ জন স্বয়ংসেবক শিক্ষার্থী ও ৪ জন শিক্ষক গিয়েছিলাম। আমি ও গৌরাঙ্গদা (দণ্ডের), বিজয় কুলকর্ণী (অসম) ও অদ্বৈতদা (নিযুদ্ধ) শিক্ষক। ওই বর্গে পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস উপস্থিত ছিলেন।

তৎকালীন প্রান্ত কার্যবাহ অমলদার পরামর্শ ছিল স্বয়ংসেবক যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পেশায় নিযুক্ত সেই ক্ষেত্রের আমাদের যে সংগঠন তার সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হবে। সেই সময় মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন ছিল মালদার অলোক দাসের নেতৃত্বে D.T.A (ডেমোক্র্যাটিক টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন)। শ্যামমোহন দে কিছুদিন পূর্ণ সময়ের জন্য D.T.A-এর হয়ে প্রবাস করেছিলেন। বাঁকুড়া থেকে সত্যগোপাল ধূয়াকে বাঁকুড়া জেলার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজ্য কমিটিতে আমাকে রাখা হয়। তারপর বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর অজিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে চলতাম। পরবর্তী সময়ে ওই দায়িত্ব আসে ডঃ অজিত ব্যানার্জীর।

১৯৯২ সাল রামমন্দির নির্মাণের করসেবায় ডাক এলো। তখন উত্তর প্রদেশে কল্যাণ সিংহ সরকার। এই করসেবায় অভুতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। প্রায় ৭ লক্ষ করসেবকের সমাগম হয়। বাঁকুড়া জেলা থেকে ১০০ জনের মতো সংখ্যায় অংশ নেয়। করসেবক পুরমে আলাদা আলাদা প্রদেশের জন্য তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি জায়গাতেই খাবার তৈরি হচ্ছিল। সেখানে লাইন দিয়ে খাবার নেওয়া হচ্ছিল। তাছাড়া উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লরি ভর্তি লুচি ও গুড়ে প্যাকেট নিয়ে আসা হচ্ছিল। আবার অযোধ্যায় বিভিন্ন আশ্রমের ছাউনিতে খাবার পাওয়া যাচ্ছিল। একটি একতলা বাড়ির ছাদের উপর মঞ্চ তৈরি হয়। সেখান থেকে মাইকে সূচনা পাঠানো হচ্ছিল। ৫ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে আমরা করসেবা করতে পারবো কিনা তার রায় বেরুনোর কথা। কিন্তু ৪ তারিখে রায় দেওয়ার তারিখ পালটে দু সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়। বোঝা গেল এর মধ্যে সরকারের কিছু রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করছে। সকল করসেবকের মধ্যে একটা হতাশা ও আক্রোশ দেখা গেল। মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হলো ৬ ডিসেম্বর করসেবা হবে তবে 'প্রতীকী'। আমরা সকালে স্নান করে বেলা ১০ টায় ৬টা লাইন করে দাঁড়াবো এক একটি প্রদেশের করসেবকরা। প্রথমে থাকবে অন্ধ্রপ্রদেশ, তারপর মহারাষ্ট্র। আমাদের প্রদেশের স্থান হলো ৯ নং-এ। করসেবকরা সরযুনদী থেকে রুমালে করে বালি নিয়ে প্রস্তাবিত গর্ভগৃহে ওই বালি রাখতে হবে। কোনো রকম নির্মাণের কাজ হবে না। সেইমতো ৬ ডিসেম্বর আমরা লাইন করে রাস্তার উপর বসে আছি। বাড়ির ছাদের মঞ্চে বসে আছেন অশোক সিংহল জী, সুদর্শনজী, লালকৃষ্ণ আদবানীজী, সাধ্বী উমা ভারতী, মুরলী মনোহর যোশী, সন্ত রামচন্দ্র দাস পরমহংসদেব ও অন্যান্য কার্যকর্তারা। হঠাৎ পৌনে ১২ টায় একটা হই হই আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা যে স্থানে বসেছিলাম সেইস্থান থেকে জীর্ণ রামমন্দির দেখতে পাওয়া যায়নি। উমা ভারতী হঠাৎ চীৎকার করে বলতে লাগলেন, ''আরে উহ বাবরকা হাড্ডি লে যা রহা হ্যায়'। জানা গেল কে বা কারা বিতর্কিত ধাঁচার চূড়ায় উঠে পড়েছে। তারা লোহার বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলেছে। সেখানে উঠে কেউ কেউ নাচতে আরম্ভ করেছে। কেউ কেউ পিছনে নীচে পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স এসে তাদের হসপিটালে নিয়ে যায়। হাতুড়ি, শাবল নিয়ে উপরে উঠে গিয়ে সেখানে ঘা মারছে কিন্তু উপর থেকে ঘা মারলেও চূড়ার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। এই দৃশ্য দেখার পর মঞ্চে উপবিষ্ট লালকৃষ্ণ আদবানীজী বললেন 'তোমরা নেমে এসো, এত দিনের আন্দোলন বিফল হতে চলেছে।

অনেক করসেবক এই দৃশ্য দেখার জন্য ওয়াচ টাওয়ারে উঠে গেছে। আদবানীজী তাদের বলছেন 'তোমরা হাত নেড়ে ওদের নেমে আসতে বলো' উমা ভারতী খুব উচ্ছাসের সঙ্গে বলছেন, 'ভেঙ্গে ফেলো, ভেঙ্গে ফেলো, বাবরের স্মৃতি মুছে ফেল।' উপরে ঘা মেরে যখন কাজ হচ্ছে না তখন তারা নীচের দেওয়ালে ঘা মেরে সহজেই একটি গম্বুজ ভেঙ্গে ফেললো। অনুরূপভাবে ঘা মেরে দ্বিতীয়টা ভাঙ্গার শেষে তৃতীয়টা অর্থাৎ বড় গম্বুজটা ভেঙ্গে টুকরাগুলি সরিয়ে ফেলার পালা। মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হলো সকলে যেন নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যান। প্রত্যেক প্রদেশকে ডাকা হবে বাকি কাজ করার জন্য। আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে ডাকা হলো রাত্রি ২ টোর সময়। আমরা গিয়ে লাইন করে রাবিশের ঝুড়ি হাত বদলে নীচে ফেলতে লাগলাম। তারপর শুরু হলো ভিত্তি খোঁড়ার কাজ। ইট সিমেন্ট দিয়ে দেওয়াল তৈরির কাজ। খনন কার্যের ফলে অনেক পুরাতাত্ত্বিক জিনিস বার হলো, সেগুলি সবই ছিল শ্রীরামের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন, সংস্কৃতে শিলালিপিও পাওয়া গেল। সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে একটি জায়গাতে রেখে দেওয়া হলো। ওই রাত্রে অকুস্থলে কোনো যান-বাহন যাতে প্রবেশ করতে না করে জন্য অযোধ্যার সব রাস্তা বিভিন্নভাবে বেরিকেড করে রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারে তখন নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসবিচ্যবন। কেন্দ্রের কোনো পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনী যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। উত্তর প্রদেশ P.O.C কোনোরকম গুলি চালাতে রাজি নয়। উত্তর প্রদেশ সরকারের সহযোগিতায় এই ধ্বংসকার্য সম্পন্ন হয়েছে, এই অজুহাতে উত্তর প্রদেশ সরকারকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে বরখাস্ত করা হলো। তার সঙ্গে রাজস্থান ও গুজরাটের বিজেপি সরকারকেও বরখাস্ত করা হলো। দেওয়াল প্রায় ৫ ফুট উঁচু করে তোলা হলো এবং তারপর রাম লালাকে ঐ স্থানে পুনপ্রতিষ্ঠা করা হলো। বিকেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে সব ব্যারিকেড সরিয়ে অকুস্থলে পৌঁছাল। করসেবকদের কাছে নির্দেশ এল যত শীঘ্র সম্ভব ওই স্থান ছেড়ে চলে যেতে। আমরা ওখান থেকে ফৈজাবাদ স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে এলাম। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ গত ৫০০ বছরের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে গেল অযোধ্যা। তার সঙ্গে চিরতরে মুছে গেল আক্রমণকারী বাবরের নাম। এবার এলাহাবাদ হাইকোট থেকে রায় বেরুলো, রামলালার প্রাচীরের উপর ত্রিপলটা দিয়ে ঘিরে ফেলার জন্য এবং মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করতে এবং নিয়মিত পূজা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মসজিদ ভাঙ্গার দায়ে উমাভারতী, আদবানীজী, মুরীলীমনোহর যোশী, অশোক সিংহল, বিনয় কাটিহার প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা ঋজু করল। সঙ্ঘের উপর ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। বিচারের জন্য একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হলো। ট্রাইবুন্যাল কোনো দোষ খুঁজে না পাওয়ায় ৯ মাস পর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া

হলো। এই নিয়ে তৃতীয়বার সঙ্ঘকে সমাপ্ত করার অপপ্রয়াস বিফল হলো।

প্রায় এক বছর কাল আমরা প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়ে গ্রাম-পঞ্চায়ত নির্বাচনের কাজে যুক্ত হয়ে যাই। নিষেধাজ্ঞার কারণে ১৯৯৩ সালে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ বন্ধ থাকলো।

১৯৯১ সালে আমাকে বাঁকুড়া বিভাগ কার্যবাহের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ১৯৯২ জানুয়ারিতে গয়েশপুরে তিনদিনের প্রান্তীয় শীতশিবির অনুষ্ঠিত হলো। ওই শিবিরে পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজী উপস্থিত ছিলেন। তাঁবু খাটিয়ে শিবিরটি এক একটা নগরে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক নগরের জন্য পৃথক রন্ধনশালা ও বৌদ্ধিক মণ্ডপ ছিল। বিভিন্ন মহাপুরুষদের নামে। সেই ভব্য দৃশ্য আজও চোখে উদ্ভাসিত হলে আনন্দে বুক ভরে উঠে। তখন বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ছিলেন ডাঃ শচীন সিংহ। পুরুলিয়া জেলার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক আগে থেকেই ছিল। পুরুলিয়া জেলায় স্বল্পকালীন বিস্তারক হিসাবে আদ্রা অনাড়া, রঘুনাথপুরে ছিলাম। তাছাড়া ১৯৭১-৭২ সালে বি. এড পড়ার সময় পুরুলিয়া নিবাসে থাকতাম। বিভাগ কার্যবাহ হওয়ার পর পুরুলিয়া জেলার সব শাখাতেই আমার প্রবাস হয়। তখন পুরুলিয়া জেলা প্রচারক ছিলেন আনন্দময় ভট্টাচার্য। আনন্দদা আমাকে বলরামপুর, ঝালদা, বাগমুণ্ডি ও মানবাজারে নিয়ে যান।

বাঁকুড়া জেলার নিবাস ছিল 'সতীশ ভবন' বড় কালীতলায়। জরুরি অবস্থার পর বাঁকুড়া জেলা প্রচারক হয়ে আসেন বুদ্ধদেব মণ্ডল, পরে আসে দীনেন দে। বিভাগ প্রচারক ছিলেন গৌরাঙ্গ দাশগুপ্ত। পরে জেলা প্রচারক হয়ে আসেন শ্রীকান্ত নন্দী। শ্রীকান্তদার চেষ্টায় আমরা রামপুরে একটি পরিত্যক্ত পুরানো বাড়ির সন্ধান পাই। বাড়ি-সহ জমির পরিমাণ ৭ কাঠা ৬ ছটাক। এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকায় জায়গাটি 'সেবা ভারতী', বাঁকুড়া, ট্রাস্টের নামে আমরা দলিল করে নিই। এই টাকা জেলার স্বয়ংসেবকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তারপর বাড়িটির দরজা, জানালা, কড়ি বর্গার জন্য প্রদেশের শরণাপন্ন হই। প্রদেশ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা পেয়ে যাই। এই উদ্যোগে ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

২০০৪ সালে আমি শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলাম। ওই সময় আমাকে 'ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগ'-এর প্রান্ত সংযোজকের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এর আগে প্রান্ত প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হয় সুকুমার পাত্রকে, পরে গৌরাঙ্গ দাশগুপ্তকে। আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি কীভাবে কাজ করবো? পরে সনাতন মাহাতোকে প্রান্ত প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হলো। কেন্দ্রীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর কার্যপদ্ধতি বুঝতে পারলাম।

২০১১ সালে 'নর্মদা সামাজিক কুম্ভে'র ডাক দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। এই কুম্ভকে সফল করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক প্রবাস করতে হয়। সব জেলাতেই একটি করে কমিটি গঠন করা হয়। দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রায় ৭০০ জন এই কুম্ভে যোগদান করেন।

২০০৯ সালে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সরকার্যবাহের নির্বাচন। প্রতিনিধি সভার প্রথম দিনের সভায় সরকার্যবাহ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। নির্বাচন সঞ্চালক ঠিক হয়ে গেছে। মোহনজী মঞ্চ থেকে নীচে এলেন। তখন সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী বলে উঠলেন থামুন, আমার কিছু কথা আছে। বললেন, ''সঙ্ঘ আজ এত বড় প্রতিষ্ঠান, তার সর্বোচ্চ পদে আমি আছি কিন্তু অনেক সময়েই আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা সঙ্ঘের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর পক্ষে ঠিক নয়। সব দিক বিবেচনা করে আমি পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক হিসেবে ডাঃ মোহনরাও ভাগবতকে নিযুক্ত করছি।'' মোহনজীর বিস্তৃতভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনি যে এই পদের উপযুক্ত তা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেদিন সরকার্যবাহ নির্বাচন কাজ স্থগিত রইল। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে সরসঙ্ঘচালক প্রণাম দেওয়া হবে ঠিক হলো। নাগপুর নগর থেকে ৯,৫০০ জন স্বয়ংসেবক পূর্ণগণবেশে ঘোষ সমেত উপস্থিত হয়ে গেলেন। সরসঙ্ঘচালক প্রণাম সম্পন্ন হয়ে গেল। ওই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এই সময় মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ ডঃ অজিত ব্যানার্জীর নেতৃত্বে চলছিল। কিন্তু তার জীবন অবসানের পর ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হলো। সংগঠন সম্পাদক হিসাবে ছিলেন প্রচারক নারায়ণ চন্দ্র পাল। ২০১৩ সালে ত্রৈবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে। সম্মেলনে সব জেলা থেকেই অংশ নেয়। নারায়ণদার প্রচেষ্টায় এবং আশিস কুমার মণ্ডল (তখন জেলা সভাপতি)-এর সক্রিয় ভূমিকায় সম্মেলন সফল হয়। আমাকে রাজ্য সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। অরূপ সেনগুপ্ত সাধারণ সম্পাদক। নারায়ণ দা দীর্ঘদিনের পুরানো প্রচারক থাকায় তাঁর সঙ্গে প্রবাস করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। যেহেতু আমি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সেইজন্য মোটামুটি পূর্ণ সময় দিয়েই সংগঠনকে মজবুত করার কাজে লেগে যাই। এছাড়া অখিল ভারতীয় স্তর থেকে কাজের অনেক প্রেরণা পাই তখন অখিল ভারতীয় স্তরে সভাপতি ছিলেন শ্রী জগদীশ প্রসাদ সিংহল এবং সংগঠন সম্পাদক ছিলেন শ্রী মহেন্দ্র কাপুরজী (এখনো আছেন)।

২০১৫ সালে নাগপুরে রেশিমবাগে এবিআরএসএম-এর রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। নারায়ণ দা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সব জেলা থেকে যোগদানকারীর সংখ্যা ঠিক করে ফেলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হন এবং দেহরক্ষা করেন। পরে সংগঠনের জন্য অলোক চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়। অলোকদা বিদ্যাভারতী সংগঠন সম্পাদক হিসেবে কাজ দেখছিলেন। ৩০, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ ও ১ জানুয়ারি, ২০১৭ ত্রৈবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন মালদা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে পুনরায় আমাকে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ২০১৯ সালে ত্রৈবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বহরমপুরে। এই সম্মেলনে প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী পূর্ণসময় দিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয় আশিস কুমার মণ্ডলকে। আমার শরীর ভালো যাচ্ছিল না, আমি দায়িত্ব মুক্তি চেয়েছিলাম, সেই অনুসারে আমি দায়িত্ব মুক্ত হই। সাংসারিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে আর নিত্য শাখায় যেতে পারছিলাম না।

জেলা কার্যবাহ হওয়ার পর থেকে স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছি। স্বস্তিকা প্রদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় গ্রাহক করেছি। এখন সেই দায়িত্ব থেকেও মুক্ত আছি। জীবনে কোনোদিন সঙ্ঘের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হইনি। যখন যা দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে একনিষ্ঠ সৈনিকের মতো তা পালন করার চেষ্টা করেছি। □

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে এবার না পালটালে সব হারাতে হবে

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই নির্বাচন আর পাঁচটা সাধারণ নির্বাচনের মতো কেবল সরকার গড়ার লড়াই নয়; এটি হিন্দুদের ভিটেমাটি, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি হিন্দু বাঙ্গালি পরিচয়ে টিকে থাকার লড়াই। আজ প্রতিটি সচেতন নাগরিককে বুঝতে হবে, কেন এই মুহূর্তেই পরিবর্তন অপরিহার্য এবং কেন বর্তমান শাসনব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক মহাবিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকের পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমান শাসকদলের ওপর তাদের নিজেদের কোনো নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট নেই। ২০১১ সালের সেই পরিচিত রাজনৈতিক দলটির কাঠামো আজ ভেঙে পড়েছে। পরিবর্তে প্রশাসন আজ 'পলিটিক্যাল ইসলামে'র শৃঙ্খলে বন্দি। সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ হিন্দু বাঙ্গালিকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'বহিরাগত' থেকে নিয়ে 'ওরা এলে মাছ বিক্রি বন্ধ করে দেবে', এরকম বিভিন্ন গুজব ছড়ানোর কাজ কৌশলে করে চলেছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু বাঙ্গালির ভোট বিভাজনের কারণে বর্তমান শাসকদলের লাভ সুনিশ্চিত হচ্ছে।

একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে বোঝা যাবে হিন্দু বাঙ্গালির পকেট আজ কার দখলে? রাজ্যের প্রিয় কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া আজ কাদের নিয়ন্ত্রণে? যে মাছের বাজার, ফলের বাজার কিংবা অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসার মতো 'হাই মার্জিন' ব্যবসাগুলো একসময় হিন্দু বাঙ্গালির একচেটিয়া ছিল, সেখানে আজ কারা জাঁকিয়ে বসেছে? এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি একটি সুপরিকল্পিত 'ইকোনমিক অ্যাগ্রেশন' বা অর্থনৈতিক আগ্রাসন। বর্তমান রাজ্য সরকার নিঃশব্দে এই আগ্রাসনকে সমর্থন করে চলেছে। আজ উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালি যুবক টোটো চালাচ্ছেন বা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছেন, আর আমাদের পাড়ার মোড়ে মোড়ে একটি বিশেষ গোষ্ঠী পুরো বাজার দখল করে নিচ্ছে।

শাসন, বাজার ও ব্যবসা দখলের সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে জমি দখলের কাজ সুকৌশলে চলেছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ শুধু নয়, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া বা কলকাতার হৃদপিণ্ডে যারা বাস করছেন, তারা চোখ মেললেই দেখতে পাবেন এক ভয়ংকর বাস্তব। আমাদের অতি পরিচিত পাড়াগুলো আজ আমাদের অজান্তেই 'নো-গো জোন'-এ পরিণত হয়েছে। শাসকের সহযোগিতা ছাড়া বাজার, ব্যবসা, জমি বা অন্যান্য ব্যবস্থা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দ্বারা দখল করা সম্ভব নয়।

আজকের পশ্চিমবঙ্গের আসল চিত্রটা এরকম। চারিদিকে মবোক্রেসি বা উন্মত্ত জেহাদির তৎপরতা, সন্দেশখালির মতো নারকীয় ঘটনা, আর মা-বোনেদের সম্মানের ওপর প্রতিনিয়ত আঘাত। থানায় কোনো অপরাধের বিচার চাইতে গেলে পুলিশকে চুপ করে থাকতে হয় বা বিশেষ সম্প্রদায়ের অপরাধীদের আড়াল করতে প্রশাসন ঢাল হয়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝতে হবে এই শাসন আর আইনের হাতে নেই। যারা এই পচনশীল ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তারা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, তত বেশি সুকৌশলে বিভিন্ন কল রেকর্ড, মিথ্যা সত্য ভিডিয়ো বা বিকৃতি তথ্য ছড়িয়ে দেবে। এটি একটি বিশাল 'ন্যারোটিভ ট্র্যাপ' বা প্রচারের ফাঁদ। রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করা হবে যে 'অমুক প্রার্থী ভালো নয়' কিংবা 'এই দলে গোলমাল আছে'। এই ছোটোখাটো ত্রুটিগুলো বড়ো করে দেখানোর উদ্দেশ্যই হলো ভোটারদের আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা।

মনে রাখতে হবে, ঘরের যখন আগুন লেগেছে, তখন ঘরের আসবাবপত্রের ধুলো পরিষ্কার করার বিলাসিতা দেখানোর সময় এখন নয়। নিজের ছোটোখাটো মান-অভিমান বা প্রার্থীর খুঁত ধরার সুযোগ নিয়ে শত্রু আজ হিন্দুদের দরজায় কড়া নাড়ছে। আসল শক্তি সৃষ্টি হয় জনগণের ভেতর থেকে, আর সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশ হওয়া দরকার নির্বাচনের মাধ্যমে।

রাজ্যবাসীর বর্তমান সংকল্প হওয়া উচিত একটাই— আগে এই দুঃশাসনকে উপড়ে ফেলা। শরীরের বড়ো রোগ সারাতে হলে আগে প্রাণ বাঁচানো প্রয়োজন, ছোটোখাটো ক্ষতের চিকিৎসা পরেও করা সম্ভব। আজ যদি এই আগ্রাসী শক্তির কবজা থেকে রাজ্যবাসী পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করতে না পারেন তবে ভবিষ্যতে ভাবনা করার মতো কোনো পরিবেশই আর অবশিষ্ট থাকবে না। রাজ্যবাসীর একটি সিদ্ধান্তই পারে এই অপশাসনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে, প্রার্থীর চুলচেরা বিশ্লেষণ সরিয়ে রেখে, একজোট হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের লড়াই লড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, আজ যদি এই শাসনকে না পালটানো যায়, তবে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্বটাই ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে হিন্দু বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্ব সেই পলিটিক্যাল ইসলামের হাতেই বন্দি হয়ে গেছে। সেখানে তাদেরই প্রকাশ্যে শাসন চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গে তারা বর্তমান শাসকদলের মাধ্যমে শাসন চালাচ্ছে। তাই আগে পালটাতে হবে, অস্তিত্ব বাঁচাতে হবে--- বাকি সব সংস্কার করার সময় ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে। তাই এবার না পালটালে সব হারাতে হবে। □